MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড

www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র
রেজি. নং ডিএ ১৩২৬ : ২২তম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা
নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২৫
দাম : দশ টাকা

ব্লক রেইড দিয়ে সিলেট বাসদ অফিস থেকে নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ : পৃষ্ঠা ৩

সোভিয়েতের পতন ও ঐতিহাসিক মিথ্যাচার : পৃষ্ঠা ৪

মামদানির জয় এবং তারপর : পৃষ্ঠা ৭

অসঙ্গতিপূর্ণ জুলাই সনদে স্বাক্ষর করেনি চার বামদল : পৃষ্ঠা ১৬

জনতার অভ্যুত্থান জনগণের হাতছাড়া : শাসক গেছে কিন্তু শোষণ আছে

দেশি-বিদেশি লুটেরা গোষ্ঠীর অদলবদল চলছে

গণ অভ্যুত্থান গণমুখী না হলে জনজীবনে দুর্যোগ আসে, হতাশা নামে। অন্যদিকে হাত বদল হওয়া বুর্জোয়া গোষ্ঠীসমূহ হরিলুটের তাণ্ডবে মাতে। জনগণের ঐক্য ও সঠিক নেতৃত্ব ভবিষ্যতের কর্মদিশা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার করে হাজির করে। মিলিত মানুষের কর্মোদ্যোগ গতি পায়। অন্যথায় সাম্রাজ্যবাদনির্ভর বুর্জোয়াদের দেখানো পথে চলতে গেলে পথ হারানো পথিকের অবস্থা তৈরি হয়। ক্ষমতা এবং জনতার মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে। উচ্ছেদ হওয়া লুটেরা দল ও গোষ্ঠী পুনর্বাসনের পথ খোঁজে এবং ক্ষমতাকেন্দ্রিক লুটেরাগোষ্ঠীর চোরের বদলে বাটপারি চেহারা পুনর্বাসনের সে পথ সুগম করতে থাকে। এবারের গণ অভ্যুত্থান পরবর্তী আমাদের দশা তার থেকে ভিন্ন কিছু নয়। কারণ গণচেতনার মান ও নেতৃত্ব বিপ্লবী অভ্যুত্থানের অর্থাৎ আমূল পরিবর্তনকামী চেতনা ও শক্তির নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়নি। ফলে ১৫ মাস পরে এসে আলো ফুটছে না, আঁধার সরছে না বরং আঁধার আরও ঘনীভূত হয়ে আসছে। গুজব-শঙ্কা, সন্দেহ-অবিশ্বাস, সহিংসতা বাড়ছে। আদৌ ভোট হবে কি না, সামরিক শাসন জরুরি অবস্থা চাপবে কি না, অন্তর্বর্তী সরকার জাতীয় সরকারের রূপ নেবে কি না, ভোট হলে জোর যার মুল্লুক তার এর জালিয়াতি, খুনোখুনি হবে কি না, ভোট কেন্দ্রে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি থাকবে কি না ইত্যাদি কানাঘুষা চলছে। সংস্কারের নামে বস্তা বস্তা কাগজ আর মাসের পর মাস সময় পার করে এখন দেখা যাচ্ছে গোপন ইচ্ছা বাস্তবায়ন দলিলের নকশা হাজির করা হচ্ছে। বাসদ-সহ ৪টি বামপন্থি দল সনদে স্বাক্ষর করেনি। যারা করেছেন তারা এখন প্রতারিত হয়েছেন বলে বুক চাপড়াচ্ছেন। তাদের সান্তনা দিতে ভোটের আয়োজনের কথা জোরেশোরে বলা হচ্ছে। বিদ্যমান সংবিধানে ‘গণভোটের’ কোন বিধান না থাকার পরও কথিত গণভোট নিয়ে চলছে কথা কাটাকাটি। বিদ্যমান সংবিধানে আদেশ জারির বিধান না থাকার পরেও রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে জুলাই সনদের আশে জারি করা হয়েছে, যা ভবিষ্যতে এক সাংবিধানিক প্রশ্ন তৈরি করে শাসন সংকট বাড়াতে পারে।

গণভোট আগে হবে না জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরে, নাকি এক সাথে হবে এই বিতর্কে জনজীবনের অন্য সকল জরুরি বিষয় ধামাচাপা পড়ছে। অতীতে দেশে ৩টি গণভোট হয়েছিল। দুইটি দুই সামরিক শাসকের পক্ষে জনগণের হ্যাঁ কিংবা না পরীক্ষা। একশতের মধ্যে আটানব্বইর বেশি নম্বর পড়েছিল। তৃতীয়টি ছিল রাষ্ট্রপতি শাসন থেকে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির শাসনে উত্তরণের গণরায় যাচাই। সেখানে মাত্র ৩৫ শতাংশ ভোট পড়েছিল তার মধ্যেও ৩০ লাখ না ভোট। এক্ষেত্রে জনমত ভারী থাকায় ভোট সংখ্যা নিয়ে মানুষ মাথা ঘামায়নি। কিন্তু এবারের চতুর্থ পরীক্ষা প্রায় ৩০ পৃষ্ঠার ৮৪টি বিষয়ে সুপারিশ রয়েছে সনদে, যার মধ্যে ৪৮টি সুপারিশ সংবিধান সম্পর্কিত ১২টিতে সবাই একমত এবং ৩৬টিতে কোনো না কোনো দলের ভিন্নমত রয়েছে। নাম দস্তখত করতে পারে, টাকা চেনে এবং গুনতে পারে দু-চার লাইন লিখতে বা পড়তে পারে, এ ধরনের লোকসহ শতকরা ষাট ভাগ নিরক্ষর লোকের দেশে রাষ্ট্র শাসন, সংবিধান বদলসহ জটিল পাঠ এক নজরে সেরে জনগণ মতামত দেবে এ ধরনের আজগুবি চিন্তা মহাধান্দা করা মাথা ছাড়া আসা কঠিন।

দেশে এককেন্দ্রিক একমুখী স্বৈরাচারী ধারা সরিয়ে এখন এককেন্দ্রিক ত্রিমুখী স্বেচ্ছাচারী ধারা চলমান। শেখ হাসিনা কেন্দ্রিক এক আওয়ামী ধারার স্থলে ড. ইউনূস-কেন্দ্রিক বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও ড. ইউনূস এর দল এনসিপি-র ত্রিধারা-উপধারা দৃশ্যমান। ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে ঐক্য চেষ্টা ও সংঘাত কোন্দল বাড়ছে। জনগণ দিশেহারা। এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক ভারতীয় চিল এর বদলে মার্কিন বাজপাখি আকাশে উড়ছে, মাটিতে লক্ষ্যবস্তু শিকারের উপর ছোবল মারছে। চট্টগ্রাম বন্দর, কথিত মানবিক করিডোর, অস্ত্র কারখানার অনুমতি, স্টার লিংককে আকাশ সেটেলাইটের নিয়ন্ত্রণ দেওয়া, লালমনিরহাট, বঙ্গোপসাগরের ছায়া বিস্তৃত হয়ে আছে। মার্কিনের সাথে গোপন চুক্তিতে ইতিমধ্যে দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় হিন্দুত্ববাদের সাথে পাল্লা দিয়ে মুসলমানিত্ববাদ চাঙ্গার চেষ্টা চলছে। আফগানিস্তানে তালেবানি শিক্ষা নিতে মৌলবাদী এক গোষ্ঠী সম্প্রতি আফগানিস্তান সফর করে এসেছে।

মাজার-মন্দির ভাঙা, গীত-সংগীতে বাধা দেওয়া, নারীদের পোশাকের নমুনা ও গতিবিধির সীমানা নির্ধারণ করা, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতির টুটি চেপে ধরা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংগীত ও শরীর

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

এক শাসকের বিরুদ্ধে আর এক শাসক নয়—বামপন্থিরাই প্রকৃত বিকল্প

মুক্তিযুদ্ধ ও গণ অভ্যুত্থানের চেতনা উর্ধ্বে তুলে ধরুন

বন্দর ইজারা দেওয়ার চক্রান্ত, দুর্নীতি–লুটপাট ও সাম্প্রদায়িকতা বন্ধ কর

দ্রুত গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের তপশিল ঘোষণা কর

বাসদ-এর ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ১০৮তম বার্ষিকী পালিত

৭ নভেম্বর ’২৫ বাসদ-এর ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং মহান রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ১০৮তম বার্ষিকতে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে সমাবেশ ও শেষে দাবিদাওয়াসম্বলিত ব্যানার, ফ্যাস্টুনসহকারে একটি সুসজ্জিত লাল পতাকা মিছিল রাজধানীর প্রেসক্লাব-পল্টন, বায়তুল মোকাররম, গুলিস্থান, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, নূরহোসেন স্কয়ার প্রদক্ষিণ করে পল্টন মোড়ে এসে শেষ হয়।

বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, সদস্য কমরেড জুলফিকার আলী। সমাবেশ পরিচালনা করেন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নিখিল দাস।

সভায় কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেন, মুক্তিযুদ্ধের কেন্দ্রীভূত চেতনা ছিল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, কিন্তু শুরু থেকেই শাসকরা হাটতে শুরু করে শোষণমূলক পুঁজিবাদী পথে। সে কারণে আমরা মুক্তিযুদ্ধের সেই চেতনা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে দল গড়ে তুলেছিলাম। ৪৫ বছর ধরে বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে এই পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছি। দেশ বর্তমানে এক ভয়াবহ সংকটে নিমজ্জিত। অর্থনীতি-রাজনীতি, সংস্কৃতিসহ সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভয়াবহ সংকট বিরাজ করছে। মানুষের জীবন জীবিকা নির্বাহ কষ্টসাধ্য হয়ে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

জনতার অভ্যুত্থান জনগণের হাতছাড়া : শাসক গেছে কিন্তু শোষণ আছে ॥ দেশি-বিদেশি লুটেরা গোষ্ঠীর অদলবদল চলছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

চর্চা শিক্ষা বন্ধ করা ইত্যাদি চলছে। আওয়ামী ফ্যাসিস্টরা মুক্তির জনযুদ্ধকে আওয়ামী যুদ্ধ বানিয়ে চেতনার ব্যবসা করেছে, তাদের অনুগামী বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর একটা বড় অংশ স্বাধীনতাবিরোধীদের সাথে মিলে মুক্তিযুদ্ধকে বাতিল করতে চাইছে। কথিত জুলাই সনদ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও সংবিধানকে চাপা দিতে চাইছে। দায়মুক্তি দিয়ে নিজেদের আইনি সুরক্ষাও তার মধ্যে রয়েছে। যদিও ইতিহাস বলে জনগণের অনুমোদন সমর্থন না থাকলে কোন সুরক্ষাই যে বাস্তবে কাজে লাগে না তা শেখ হাসিনার পতন দেখলেই পরিষ্কার বুঝা যায়। সংবিধানকে এমন কাটাছেঁড়া করে আজীবনের জন্য ক্ষমতার মসনদ পাকাপোক্ত করতে সংবিধানে কতই-না সংশোধন করলো কিন্তু সুরক্ষা হলো কি? একমুখী একাগ্রতা যে শক্তি তৈরি করে, বহুমুখী বিচ্ছিন্নতা তার শতাংশও অর্জন করতে পারে না। বিশ্ব যত কাছাকাছি আসবে, সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দুনিয়ার বড় পুঁজি ছোট পুঁজিকে অধীনস্ত করা, গ্রাস করা বা ফায়দা তোলার চেষ্টা চালাবে। পিছিয়ে পড়া দুর্বল কারণে বাংলাদেশের বুর্জোয়ারা কখনও ভারত-চীন, রাশিয়া, কখনও মার্কিন-সৌদি-পাকিস্তানে হেলে পড়ে জাতীয় স্বার্থ ও সার্বভৌমত্বকে ক্ষুণ্ন করবে। সমাজতন্ত্র ছাড়া এর হাত থেকে নিস্তার নেই। এর জন্য গদিমুখী, পুঁজিমুখী, সাম্রাজ্যবাদ মুখীদের বদলে জনমুখী আদর্শবাদীদের শক্তি বাড়াতে তার সাথে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে যুক্ত হতে হবে। ৫৪ বছর যারা দেশ শাসন করে বর্তমান হাল দাঁড় করিয়েছে তাদের দিক থেকে মুখ ফেরাতে হবে। দল ছোট হলেও বাসদের আদর্শ বড়, ছোট হলেও নীতিনিষ্ঠ আদর্শবাদী শক্তিকেই সকল প্রকার সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে বড় করে তুলতে এগিয়ে আসতে হবে।

গত ১৫ মাসে গণবিরোধী কাজ দমনে সরকারের উৎসাহ দেখা না গেলেও শ্রমজীবী জনগণের পক্ষে ন্যায্য কথা বলাকে দমন করার ক্ষেত্রে তৎপরতার ঘাটতি নেই। যেমন গণমানুষের কথা বলতে গিয়ে এবং তাদের পক্ষে দাঁড়াতে গিয়ে ৪ দফা বাসদ ও তার শ্রমিক-ছাত্রসহ অন্যান্য গণসংগঠনের নেতাকর্মীরা গ্রেপ্তার ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ১৬ এপ্রিল ২০২৫ গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সেলিম মাহমুদসহ ২২ জন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়। একইভাবে ২৯ এপ্রিল ২০২৫ চট্টগ্রামে বাসদ জেলা ইনচার্জ আল-কাদেরী জয়, ছাত্র ফ্রন্ট জেলা শাখার সভাপতি মিরাজ উদ্দিন ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ নেতা রোকনকে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় ও সম্প্রতি ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বাসদ সিলেট জেলা শাখার আহ্বায়ক আবু জাফর ও জেলা সদস্যসচিব প্রণব জ্যোতি পাল জেলা পার্টি অফিস থেকে গ্রেপ্তার হয়ে ১ মাস কারাভোগের পর জামিনে মুক্তি পেয়েছে। সর্বশেষ ১ নভেম্বর সিলেটে দ্বিতীয় দফা বাসদ অফিসে ব্লক রেইড দিয়ে পাঠচক্র করা অবস্থায় ২২ জন শ্রমিক ফ্রন্ট কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ১৫ জন এখনও কারাগারে। এবার সিপিবির নেতা ও শ্রমিক এবং ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরাও সিলেটে আটক হয়েছেন। এখান থেকেও শ্রমজীবী-শোষিত জনগণের পক্ষের প্রকৃত শক্তি বাছাই করার কাজটা সহজ হবে। পুরোনো জমিদারি ভাবনা ছেড়ে প্রজাতন্ত্রের প্রজা ভাবনায় জনগণের প্রকৃত শক্তি গঠনে এগিয়ে আসুন। বাসদ এর নীতিগত ও আদর্শগত সংগ্রামের সাথে যুক্ত হয়ে সাংগঠনিক শক্তিকে বিপ্লবী অভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানে সমর্থ করে গড়ে তুলুন। অতীতের দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে আগামীর সুন্দর ভবিষ্যত নির্মাণের স্বপ্নকে সফল করার পথে এগিয়ে চলুন। গণবিরোধী পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের তোষণ ও লালনকারীদের হাত থেকে দেশ, জাতি ও জনগণকে রক্ষায় এগিয়ে আসুন। দুঃশাসনের হবে অবসান, উড্ডীন হবে জনতার বিজয়ের নিশান।

মুক্তিযুদ্ধ ও গণ অভ্যুত্থানের চেতনা ঊর্ধ্বে তুলে ধরুন : এক শাসকের বিরুদ্ধে আর এক শাসক নয়–বামপন্থিরাই প্রকৃত বিকল্প

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দাঁড়িয়েছে। '২৪-এ ছাত্র-শ্রমিক জনতা বুকের রক্ত ঝরিয়ে, জীবন দিয়ে ফ্যাসিবাদী সরকারকে উচ্ছেদ করে গণ অভ্যুত্থান সংগঠিত করেছিল। আশা ছিল বাংলাদেশ নতুন পথ খুঁজে পাবে। কিন্তু ১৫ মাসের মাথায় এসে দেখা গেল গণ অভ্যুত্থানের ফসলও বেহাত হতে চলেছে। স্বাধীনতার পর ধারাবাহিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে দেশ পরিচালনা করায় যে সামরিক স্বৈরতন্ত্র কায়েম হয় তা থেকে গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকার ফিরে পাওয়ার লক্ষ্যে '৯০ সালে গণ অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়েছিল কিন্তু যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল তারাও গণ অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষার পথে হাঁটেনি। সে কারণেই '২৪ সালে আবারও গণ অভ্যুত্থান সংঘঠিত হয়েছে। এবারও মানুষের আশা দুরাশায় পরিণত হতে চলেছে।

দেশের বিগত ৫৪ বছরের শাসন ও সংগ্রামের ইতিহাসে থেকে আমাদের দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে—পরিবর্তনের জন্য অবশ্যই লড়াই চাই, কিন্তু শুধু লড়াই আর জীবনদানে মানুষের মুক্তি আসে না। তার জন্য লাগবে সঠিক বিজ্ঞানভিত্তিক আদর্শ, তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মেহনতি মানুষের নিজস্ব বিপ্লবী দল ও তার নেতৃত্বে আন্দোলন পরিচালনা করতে পারা। আন্দোলন করে জনগণ, জীবন দেয় মানুষ, ক্ষমতায় বসে সুদি কারবারি মহাজন, লুটপাটকারি ধনিকশ্রেণি।

আমরা অভ্যুত্থানের পরেই বলেছিলাম—এই সরকারের নেতৃত্বে যারা আছে তাদের শ্রেণি অবস্থান, মতাদর্শ শ্রমজীবী মেহনতি জনগণের পক্ষের নয়। এরা লুটপাটকারী ধনিকশ্রেণি, কালোবাজারি, ব্যাংক-ডাকাত, মুনাফালোভী, মজুতদার ও সাম্রজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষাকারী। গত ৫৪ বছর ধরে যারা রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিলেন, তারা রাষ্ট্রকে দলীয়করণ, দুঃশাসন ও দুর্নীতির চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। সে কারণেই রাষ্ট্রীয় শাসন ও প্রশাসন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক সংস্কারের দাবি জোরালো হয়। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে রচিত সংবিধানে উল্লেখ আছে যে, কেন্দ্র থেকে প্রান্ত পর্যন্ত সর্বস্তরে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধির দ্বারাই রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। কিন্তু বিগত স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার শাসনামলে ভোটারবিহীন, নিশি রাতের ও 'আমি ডামি'র নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ভোটাধিকার হরণ করে দেশ শাসন করেছে। নির্বাচনকে নির্বাসনে এবং গণতন্ত্রকে কবরে পাঠানো হয়েছিল।

তিনি আরও বলেন, জনগণ আশা করেছিল, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হত্যাকাণ্ডের বিচার করবে এবং সকল রাজনৈতিক দল ও মানুষের মতামতের ভিত্তিতে সর্বসম্মত সংস্কার বাস্তবায়ন করে একটি সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। কিন্তু তাদের মনোযোগ যেখানে থাকা উচিত ছিল, সেখানে নেই।

কমরেড ফিরোজ আরও বলেন, সংবিধান সংস্কারের নামে মূলনীতিসহ সম্পূর্ণ খোলনলচে বদলে ফেলার চেষ্টা চলছে। যদি শেখ হাসিনা বা আওয়ামী লীগকে জুলাই অভ্যুত্থানের ইতিহাস লেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলে সেই ইতিহাস কেমন হবে? একইভাবে, ১৯৭১ সালে যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল, রাজাকার, আলবদর, আল শামস বাহিনী গঠন করেছিল ও গণহত্যায় সহায়তা করেছিল, তাদের হাতে যদি সংবিধান সংস্কারের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তবে কী ধরনের সংবিধান রচিত হবে? অন্তর্বর্তীকালীন ইউনূস সরকার মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তির পরামর্শে সংবিধান পরিবর্তন করতে চাইছে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদের চার মূলনীতিকে বদলে দিয়ে নতুন সংবিধান রচনার প্রচেষ্টা চলছে। বাংলাদেশের মানুষ এটা কখনোই মেনে নেবে না; এটি একদিন দুরাশায় পরিণত হবে।

তিনি বলেন, এই সরকার ভারতবিরোধী স্লোগান দিলেও গত ১৪ মাসে ভারতের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলো প্রকাশ করেনি। জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তি বাতিলেরও কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। শেখ হাসিনা সরকার ভারতের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছিল, আর এই সরকার আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের স্বার্থে দেশবিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার মূলত একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার, যার জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার নেই। অথচ তারা চট্টগ্রাম বন্দর বিদেশি কোম্পানির কাছে ইজারা দেওয়ার চক্রান্ত করছে এবং ডিসেম্বরের মধ্যে এটা হস্তান্তরের ঘোষণা দিয়েছে। মার্কিন স্বার্থে মিয়ানমারের সাথে কথিত মানবিক করিডোর চুক্তি করারও পরিকল্পনা ছিল, যা জনমতের চাপে স্থগিত আছে–কিন্তু বাতিল করা হয়নি।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর উপদেষ্টারা ডিফেন্স ইকোনোমিক জোন স্থাপন ও তুরস্কের সাথে অস্ত্র কারখানা নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের আকাশ-নিরাপত্তা মার্কিন কোম্পানি স্টারলিংকের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, যা দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তাকে মারাত্মক হুমকির মুখে ফেলেছে।

তিনি বলেন, গত ১৫ মাসে সরকার দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল, মানুষের জীবন-জীবিকা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। জনগণ এখন এই সরকারের কাছ থেকে আর কিছুই আশা করে না।

তিনি আরও বলেন, সনদ হলো রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতার দলিল। এর সাথে দেশের সংবিধানের কোনো তুলনা হয় না। সংবিধানে গণভোটের কোনো বিধান নেই, অথচ এখন সেটি নিয়েই বিতর্ক তৈরি করা হচ্ছে। কেউ নির্বাচনের দিন, কেউ আগেই গণভোট চাইছেন। আমরা স্পষ্ট বলেছি, সংবিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালিত হয় এবং সেখানে গণভোটের কোনো বিধান নেই। তাই গণভোট অপ্রয়োজনীয়। সর্বাগ্রে জাতীয় সংসদের নির্বাচন দিতে হবে।

এই সরকার যতদিন ক্ষমতায় থাকবে, সংকট ততই গভীর হবে। তাই অতি দ্রুত নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করুন এবং দায়িত্ব থেকে বিদায় নিন।

কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন জাতীয় প্রেসক্লাবে আন্দোলনরত শিক্ষকদের দাবির প্রতি একাত্মতা পোষণ করে বলেন, মানব শিশু অসহায় অবস্থায়ই পৃথিবীতে আসে। এই অসহায় শিশুকে পরিবার, শিক্ষক ও সমাজের সহায়তায় একজন পূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হয়। শিক্ষক হচ্ছেন শিশুদের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার কারিগর। কিন্তু এই শিক্ষকরা আজ সমাজে অবহেলিত, ফুটপাতে বসবাসকারী। সরকার তাদের দাবিদাওয়াকে আমলে নিচ্ছে না। কমিউনিস্ট ইশতেহারে মার্কস ও এঙ্গেলস লিখেছিলেন—'এতদিন যেসব পেশা-বৃত্তিকে মানুষ সম্মান করে এসেছে এবং দেখে এসেছে শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমের চোখে, সেসব প্রতিটি পেশা-বৃত্তির মাহাত্ম্যই বুর্জোয়াশ্রেণি ঘুচিয়ে দিয়েছে। চিকিৎসাবিদ, আইনজীবী, পুরোহিত, কবি, বিজ্ঞানী–সবাইকেই এরা পরিণত করেছে নিজেদের বেতনভুক মজুরি-শ্রমিকে। ...বুর্জোয়াশ্রেণি পরিণত করেছে নিছক টাকাকড়ির সম্পর্কে।

শ্রমিকদের শ্রম ছাড়া কারখানার চাকা ঘোরে না, রিকশা-বাস চলে না, বিদ্যুৎ লাইন কাজ করে না। অথচ এই শ্রমিকদের জীবনই সবচেয়ে বেশি দুর্বিষহ। অনেকেই এটাকে নিয়তি বলে মেনে নেন, কিন্তু আমরা যারা সমাজবিজ্ঞান বুঝতে চাই, আমরা জানি—প্রতিটি ঘটনার একটি কার্যকারণ থাকে। মার্কস-এঙ্গেলস, লেনিন-স্ট্যালিন, মাও সে-তুং আমাদের শিখিয়েছেন; দারিদ্র্য কোনো কপালের লিখন নয়, বরং শ্রম শোষণের ফল। যারা শোষণের বিরুদ্ধে কথা বলেন, তাদের লড়াই করতে হবে মুক্তি না আসা পর্যন্ত।

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল যাত্রা শুরু করেছিল একটি বিজ্ঞানসম্মত হাতিয়ার নিয়ে—শোষণের বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়ার লক্ষ্যে। এই দেশকে বলা হয় 'সোনার বাংলা,' শত শত বছরের ইতিহাস জুড়ে এর সম্পদ লুট হয়েছে। ব্রিটিশরা 'গোল্ডেন বেঙ্গল' বলে শাসন করেছিল, আর আমাদের সম্পদ নিয়ে ইংল্যান্ডে সম্পদ বানিয়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে ১৯০ বছর লড়াই করেছেন ক্ষুদিরাম, আশফাক উল্লাহ, তিতুমির, প্রীতিলতা সূর্যসেন, সুভাষ বসু, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্রের মতো মানুষ।

তিনি বলেন, আমরা স্বাধীনতা চেয়েছিলাম, পেলাম দেশভাগ। চেয়েছিলাম সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব; পেলাম সাম্প্রদায়িকতা। '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৬৪-এর শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬-এর ৬ দফা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান–সবই ছিল শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে মানুষ প্রাণ দিলেন, মা-বোন সম্ভম হারালেন কিন্তু স্বাধীনতার পরও আমরা পেলাম না সাম্য কিংবা সামাজিক সুবিচার। পেলাম লুটপাট।

১৯৭২ সালে কোটিপতি ছিল মাত্র ৫ জন; ১৯৭৪ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মধ্যেই তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৭ জনে। একদিকে লক্ষ মানুষ না খেয়ে মরছে, অন্যদিকে নতুন নতুন কোটিপতির জন্ম–এটাই ছিল বাস্তবতা। মানুষ ভাবতে শুরু করল–'পাকিস্তান তাড়িয়ে লাভ কী হল?' জিয়াউর রহমানের আমলে খাল খনন করা হলো, কিন্তু সেই খালে এল নতুন কুমির–কৃষক ফসলের ন্যায্য দাম পেল না। গার্মেন্টস শিল্প চালু হলো, শ্রমিকরা কাজ পেল, কিন্তু তাদের ন্যায্য মজুরি ও মানবিক মর্যাদার জীবন নিশ্চিত হলো না।

১৯৮০ সালে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল প্রতিষ্ঠা করেন কমরেড খালেকুজ্জামান। তিনি বলেছিলেন, 'বারবার আমরা সংগ্রাম করব, জীবন দেব, আর সংগ্রামের ফল আত্মসাৎ করবে ধনিকশ্রেণি?' আমাদের লক্ষ্য ছিল–শোষণের কারণ চিহ্নিত করা এবং তা দূর করা।

আজ বাংলাদেশ আঠারো কোটি মানুষের দেশ, পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম শ্রমশক্তি। প্রবাসী আয়ের দিক থেকে নবম। ১৯৭১ সালে খাদ্যশস্য উৎপাদন ছিল ১ কোটি ১০ লাখ টন, এখন ৪ কোটি ৫০ লাখ টন–জনসংখ্যা সাড়ে ৭ কোটি থেকে আড়াইগুণ বেড়ে ১৮ কোটিতে পৌঁছালেও খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে সাড়ে ৩ গুণ। তবু ২৬% মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে, ৩৮% শিশুর শারীরিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয় অপুষ্টিতে।

১৯৭১ সালে মাথাপিছু আয় ছিল ১১০ ডলার, এখন ২,৫৯৩ ডলার। জিডিপি ৯ বিলিয়ন ডলার

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

ব্লক রেইড দিয়ে সিলেট বাসদ অফিস থেকে নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ

বাসদ-সিপিবি নেতৃবৃন্দের মুক্তি ও হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি

সিলেটের বাম রাজনৈতিক দল ও সংগঠনসমূহের সমাবেশে নেতৃবৃন্দ

ব্লক রেইড দিয়ে সিলেট বাসদ অফিস থেকে পাঠচক্র করার সময় ২২ নেতাকর্মী এবং সিপিবি নেতা অ্যাড. আনোয়ার হোসেন সুমনসহ ১৫ জনকে গ্রেপ্তার ও বাসদ সিলেট জেলার আহ্বায়ক আবু জাফর এবং সদস্যসচিব প্রণব জ্যোতি পালসহ শ্রমিকদের নামে করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং গ্রেপ্তারকৃতদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে ৫ নভেম্বর '২৫ জেলার কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে সিলেটের বাম রাজনৈতিক দল ও সংগঠনসমূহের উদ্যোগে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক বজলুর রশীদ ফিরোজ, সিপিবি কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ হিল কাফি রতন, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সদস্য অ্যাড. শফিউদ্দিন কবীর আবিদ, সাম্যবাদী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সদস্য সুশান্ত সিনহা সুমন, গণতান্ত্রিক ছাত্র কাউন্সিলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফাহিম আহমেদ। জেলা নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিপিবির সভাপতি সৈয়দ ফরহাদ হোসেন, বাসদ জেলা আহ্বায়ক আবু জাফর, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের জেলা সম্পাদক সিরাজ আহমদ, সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাসদ (মার্কসবাদী) জেলা নেতা সঞ্জয় দাস। সমাবেশ পরিচালনা করেন বাসদ জেলা সদস্যসচিব প্রণব জ্যোতি পাল।

সমাবেশে কমরেড ফিরোজ বলেন, সারাদেশের প্রায় ৫০ লাখ ব্যাটারিচালিত রিকশা, ইজিবাইক, সমজাতীয় যানবাহন ও তাদের পরিবার এর সাথে যুক্ত হয়ে আছে। প্রচণ্ড দাবদাহ, প্রবল বৃষ্টি কিংবা তীব্র শীতেও নিজের জীবিকা ও যাত্রীর সুবিধার কথা ভেবে দিনে-রাতে এরা রিকশা চালায়। এই বাহনের চালকদের শারীরিক পরিশ্রম লাঘব করা, যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য আর খরচ কমানোর কথা বিবেচনা করে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে রিকশায় ব্যাটারি স্থাপন করা শুরু হয়। নির্মাণজনিত কিছুটা দুর্বলতা থাকলেও ইতিমধ্যে তার অনেকাংশই দূর করে স্থানীয়ভাবেই আধুনিকায়ন করা সম্ভব হয়েছে। ভাড়ায় সস্তা এবং শহরের অলিগলি, উঁচুনিচু পথে, গ্রামগঞ্জে যাতায়তে স্বল্প আয়ের মানুষের অপরিহার্য বাহন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সরকার বেকারদের কাজ দিতে পারছে না, সংকট ভয়াবহ। বিগত সরকারগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানা বন্ধ করে দিয়েছে, নতুন কারখানা তৈরি করেনি। অন্তর্বর্তী সরকারের ১৪ মাসে ৩৫৩টি কারখানা বন্ধ হয়েছে, সোয়া লাখ মানুষ বেকার হয়েছে। যারা এখন স্বকর্মে নিয়োজিত তাদের কাজের ওপর আক্রমণ ও তাদের ওপর নিপীড়ন নেমে এসেছে। তাদের শ্রমের উপকরণ কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এর প্রতিবাদ করতে গেলে ২৮ সেপ্টেম্বর বাসদ সিলেট জেলার আহ্বায়ক আবু জাফর ও সদস্যসচিব প্রণব জ্যোতি পালসহ ৪ জনকে গ্রেপ্তার করে মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে পাঠানো হয়েছে। ১ নভেম্বর সিলেটে বাসদ অফিসে ব্লক রেইড দিয়ে দলের নেতাকর্মীসহ রিকশা ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদের ২২ জনকে এবং ৩০ অক্টোবর রাতে সিপিবি সিলেট জেলা নেতা অ্যাড. আনোয়ার হোসেন সুমনসহ বিভিন্ন গ্যারেজ থেকে ১৫ জন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করে মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে পাঠানো হয়েছে। এর আগে ১৯ এপ্রিল এই আন্দোলনের নেতা বাসদ চট্টগ্রাম জেলা সমন্বয়ক আল-কাদেরী জয়, মিরাজ উদ্দীন ও রোকনকে গ্রেপ্তার করে।

কমরেড ফিরোজ বলেন, সুপ্রিম কোর্টের হাই কোর্ট ডিভিশন এক রায়ে বলেছে—মহাসড়ক ছাড়া সকল জায়গায় ব্যাটারিচালিত রিকশা ইজিবাইক চলাচল করতে পারবে। ফলে, যারা মহাসড়ক ছাড়া অন্যান্য সড়কে রিকশা চালাচ্ছে এবং এর পক্ষে কথা বলছে তারা তো আইন মেনেই তা করছে। বরং যারা—পুলিশ প্রশাসন, সিভিল প্রশাসন এই যানবাহন চলাচলে বাধা দিচ্ছে তারা আইন লঙ্ঘন করছে যা আদালত অবমাননার শামিল। আমরা এখানকার প্রশাসনকে বলতে চাই আপনারা আইন অমান্য করবেন না। আমরা দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে দাবি করে আসছি বৈদ্যুতিক থ্রি হুইলার ব্যবস্থাপনা নীতিমালায় ইজিবাইক, ব্যাটারি রিকশা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, বিআরটিএ কর্তৃক সমন্বিত নীতিমালার আলোকে সারাদেশে থ্রি হুইলার ও সমজাতীয় যানবাহনের

এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

চট্টগ্রাম বন্দর বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার প্রতিবাদ

নৌ মন্ত্রণালয়ের সামনে বাম গণতান্ত্রিক জোট ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী বাম মোর্চার বিক্ষোভ (ওপরে)

৮ নভেম্বর চট্টগ্রামে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সর্বস্তরের দেশপ্রেমিক জনতার সমাবেশ ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত (ডানে)

বাম গণতান্ত্রিক জোট ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী বাম মোর্চার উদ্যোগে চট্টগ্রাম বন্দর বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার প্রতিবাদে ২৭ অক্টোবর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে জমায়েত শেষে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বাম জোটের সমন্বয়ক ও বাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি সাজ্জাদ জহির চন্দন, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল কবির জাহিদ, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, বাসদ (মার্কসবাদী) সমন্বয়ক মাসুদ রানা, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলী; বাংলাদেশের সাম্যবাদী আন্দোলনের সমন্বয়ক শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, গণমুক্তি ইউনিয়নের আহ্বায়ক নাসির উদ্দিন আহমেদ নাসু, বাসদ (মাহবুব) সাধারণ সম্পাদ হারুন অর রশীদ ভূইয়া, বাংলাদেশের সোস্যালিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম প্রমুখ।

বাম গণতান্ত্রিক জোট ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী বাম মোর্চার উদ্যোগে চট্টগ্রাম বন্দর বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ৮ নভেম্বর '২৫ চট্টগ্রাম পুরোনো রেল স্টেশন এলাকায় সমাবেশ করে।

সমাবেশে বক্তব্য দেন বাম জোটের সমন্বয়ক ও বাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, সিপিবির সাবেক সভাপতি শাহ আলম, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল কবির জাহিদ, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, বাসদ (মার্কসবাদী) সমন্বয়ক মাসুদ রানা, ফ্যাসিবাদবিরোধী বাম মোর্চার সমন্বয়ক ও বাংলাদেশের সাম্যবাদী আন্দোলনের সমন্বয়ক শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, গণমুক্তি ইউনিয়নের আহ্বায়ক নাসির উদ্দিন

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

সোভিয়েতের পতন : রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতা ও ঐতিহাসিক মিথ্যাচার

[ওকল্যান্ড, ক্যালিফোর্নিয়া, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ 'ইনস্টিটিউট ফর দ্য ক্রিটিকাল স্টাডি অব দ্য সোসাইটি' (আইসিএসএস)–কে প্রদত্ত এক জুম আলোচনায় **'সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের কারণ'** শিরোনামে আলোচনা করেন **আমেরিকার মন্টক্লেয়ার স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক প্রফেসর গ্রোভার ফার**। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতনের কারণ বুঝতে বক্তব্যটি সহায়ক হবে। তাই গুরুত্ব বিবেচনায় বক্তব্যটি বাংলায় অনুবাদ করে *মাসিক ভ্যানগার্ড*-এ প্রকাশ করা হলো। অনুবাদের ত্রুটিতে বিষয়বস্তুর কোনো ব্যত্যয় ঘটলে দায়িত্ব আমাদের সম্পাদক]।

সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের আগে পর্যন্ত বামপন্থিরা ভাবতেন কোন সমাজতান্ত্রিক দেশ শুধু বাইরের ষড়যন্ত্র বা আক্রমণের কারণেই ধ্বংস হতে পারে। এখন আমরা উপলব্ধি করি যে এই ধারণাটা কত ভুল। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পেছনে মূল কারণ ছিল আভ্যন্তরীন বিশ্বাসঘাতকতা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পেছনের কারণগুলি উদ্ঘাটন করা একটা বড় চ্যালেঞ্জ যা আজকের দিনের মার্কসবাদী, সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমার আজকের আলোচনার বিষয় এটিই। আমি শুরু করতে চাই মিখাইল গর্বাচেভকে দিয়ে।

১৯৮৫ সালে, যখন গর্বাচেভ সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারি হিসেবে ক্ষমতায় আসলেন, তার আগেই তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের সমাপ্তি টানার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছিলেন। আমি শুরুতেই গর্বাচেভের ঘনিষ্ঠ সহচর আলেকজান্ডার ইয়াকোভলভের ২০০০ সালের একটি লেখা দিয়ে শুরু করতে চাই। গর্বাচেভ ১৯৮৫ সালে পার্টির সেক্রেটারি হওয়ার পরপরই ইয়াকোভলেভকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির প্রোপ্যাগান্ডা (প্রচার) বিভাগের প্রধান হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। এভাবে ইয়াকোভলেভ পর্যায়ক্রমে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, পলিট ব্যুরোর সদস্য ও রাষ্ট্রপতির সিনিয়র উপদেষ্টা পর্যন্ত হন।

অনেকেই হয়তো *ব্ল্যাক বুক অফ কমিউনিজম* বইটির নাম শুনেছেন। ১৯৯৯ সালে ফ্রান্স থেকে প্রকাশিত এই বইটি বৈশ্বিক বাম আন্দোলনের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও অপবাদে ভরা একটি বই যা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ইয়াকোভলেভ এই বইটির রুশ ভাষায় অনূদিত সংস্করণের ভূমিকা লিখেছিলেন।

ইয়াকোভলেভ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সোভিয়েত সমাজতন্ত্র নিয়ে তাদের ষড়যন্ত্রকে এভাবে বর্ণনা করেছিলেন :

বিংশতিতম কংগ্রেসের পর আমরা আমাদের বন্ধুদের ও সমমনাদের অতিসংকীর্ণ মহলে প্রায়ই দেশে ও সমাজে গণতন্ত্রায়নের সমস্যা নিয়ে আলাপ করতাম। আমরা একটা সহজ পদ্ধতি বের করার চেষ্টা করলাম যা একদম হাতুড়ির মতো কাজ করবে—যেমন 'লেনিনের চিন্তাকে ছড়িয়ে দেওয়া'। আসলে বলশেভিকদের কর্মকাণ্ডকে গত শতাব্দীর মার্কসবাদ থেকে পরিষ্কারভাবে, সংক্ষিপ্ত ও স্বতন্ত্রভাবে আলাদা করে দেখানোটা খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। একারণেই আমরা প্রয়াত লেনিনের তুখোড় চিন্তার অকুণ্ঠ প্রশংসা করতাম। লেনিনের চিন্তায় ফিরে গিয়ে 'সমাজতন্ত্রের বিনির্মাণ পরিকল্পনা' অনুযায়ী পারস্পরিক সহায়তা, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আমরা কথা বলতাম।

এরপর একটি সত্যিকারের সংস্কারবাদী গোষ্ঠীর জন্ম হলো যারা একটি পরিকল্পনা দাঁড় করাল। পরিকল্পনাটি ছিল লেনিনের কর্তৃত্বের উপর ভিত্তি করে স্তালিন ও স্তালিনবাদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করা। এটা সফলতার মুখ দেখলে লেনিনকে প্লেখানভ ও সামাজিক গণতন্ত্রের চিন্তা দিয়ে পরাস্ত করা এবং উদারনৈতিকতাবাদ ও আদর্শিক সমাজতন্ত্রবাদ দিয়ে বিপ্লবের ধারণাকেই পর্যুদস্ত করা।

'স্ট্যালিনের ব্যক্তিপূজা' নিয়ে প্রচারের একটি নতুন দফা শুরু হয়েছিল। কিন্তু ক্রুশ্চেভের মতো আবেগঘন চিৎকার দিয়ে নয়, বরং স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে : অপরাধী কেবল স্ট্যালিনই নন, বরং ব্যবস্থা নিজেই অপরাধী।

ইয়াকোভলেভ আরও বলেন, সোভিয়েত সর্বগ্রাসী শাসনব্যবস্থাকে কেবল গ্লাসনস্ত এবং পার্টির সর্বগ্রাসী শৃঙ্খলার মাধ্যমে ধ্বংস করা যেতে পারে, কিন্তু একে সমাজতন্ত্রের উন্নতির স্বার্থের মোড়কে পেঁচিয়ে এই কাজটি করতে হবে।

ইয়াকোভলেভ কমিউনিজম সম্পর্কে তার মতামত নিম্নরূপে তুলে ধরেন। এখানে মনে রাখতে হবে, তিনি কমিউনিস্ট পার্টির প্রচারণার প্রধান ছিলেন এবং গর্বাচেভের ডান হাত ছিলেন। এর চূড়ান্ত সংস্করণে বলশেভিজমের আমার সংজ্ঞা এইরকম :

'ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে, বলশেভিজম হলো সামাজিক উন্মাদনার একটি ব্যবস্থা, যেখানে কৃষক-অভিজাত, বণিক-উদ্যোক্তাদের সমগ্র স্তর, ধর্মযাজক, বুদ্ধিজীবিদের এবং সমগ্র বুদ্ধিমত্তাকে শারীরিকভাবে ধ্বংস করা হয়েছিল। এটি হল 'ইতিহাসের কালো দাগ' যা লভভ থেকে মাগাদান, নরিলস্ক থেকে কুশকা পর্যন্ত গণকবর খনন করেছিল। এটি ছিল সকল বৈষম্যের উপর দাঁড়িয়ে মানুষের শোষণ ও পরিবেশের ধ্বংসযজ্ঞ। এগুলি মানবতাবিরোধী নীতি, যা আদর্শিক উন্মাদনার আঘাতে নিজস্ব তুচ্ছতাকে লুকিয়ে রাখে। এটি একটি রাক্ষুসে শক্তির ল্যান্ডমাইন যা প্রায় পুরো বিশ্বকে উড়িয়ে দিয়েছে।

দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে, এটা বাস্তব প্রক্রিয়াগুলির উপর এক ধরনের আত্মকেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক দ্বন্দ্বগুলির ভুলভাল ব্যাখ্যা। এই চিন্তাপদ্ধতির মূল কথা হলো এক ধরনের সামাজিক আত্মকেন্দ্রিকতা এবং সকল বিরোধী মতকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়া। এটা মূলত গোঁড়ামির পরাকাষ্ঠা, সত্যের প্রতি একধরনের ভোক্তাসচেতন মনোভাবেরই নিকটবর্তী ও সর্বশেষ ফলাফল।

অর্থনৈতিক দিক থেকে দেখলে, এটা হলো সর্বোচ্চ ব্যয়ে সর্বনিম্ন ফলাফল, কারণ এখানে স্বেচ্ছাকৃতভাবে অস্বীকার করা হয় মূল্যের সূত্রকে, উৎপাদন শক্তিগুলির মধ্যেকার অরাজকতা ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যেকার আমলাতান্ত্রিকতাকে, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগতভাবে পিছিয়ে থাকাকে, স্থবিরতা বেড়ে যাওয়াকে। এটা বৈশ্বিকভাবে মানুষকে গাড়ির চাকা বানানোর একটি ভালো উপায়, এবং সম্ভবত একমাত্র উপায়।

আন্তর্জাতিকভাবে, এটা জার্মানের নাৎসিজম, ইতালিয়ান ফ্যাসিবাদ, স্পেনের ফ্রাংকোবাদ এবং পলপটিজমের ঘরানার একটি ঘটনা। আধুনিক স্বৈরতন্ত্রের শাসনাঙ্গুলির মধ্যে প্রতিটি দেশেরই কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে কিন্তু মূলসুর একই।

আমাদের এবার নিজেরা নিজেদের প্রশ্ন করা দরকার, এমন একজন মানুষ, যে কিনা সাম্যবাদ তো দূরে থাকুক, সমাজতন্ত্রকে এমনতরও ঘৃণা করে যে সে সমাজতন্ত্রকে নাৎসিজম ও ফ্যাসিবাদের সাথে তুলনা করে—তিনি কীভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বিতীয় ক্ষমতাধর মানুষে পরিণত হলেন?

পিছনে ফিরে তাকালে, আমি গর্বের সাথে বলতে পারি যে চতুর কিন্তু খুব সহজ কৌশল —সর্বগ্রাসী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সর্বগ্রাসী ব্যবস্থার প্রক্রিয়া ব্যবহার করা—কাজ করেছিল। আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রামের অন্য কোনও উপায় ছিল না। বলশেভিকবাদ যেকোনো গণতান্ত্রিক সংস্কার, যেকোনো ভিন্নমতকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

উদাহরণস্বরূপ, ১৯৮৭-৮৮ সালে এবং আংশিকভাবে ১৯৮৯ সালে আমার কাজ এবং বক্তৃতাগুলি মার্কসের এবং বিশেষ করে লেনিনের উদ্ধৃতি দিয়ে পরিপূর্ণ ছিল। সৌভাগ্যবশত, লেনিনের প্রায় যেকোনো মৌলিক বিষয়ে আপনি যতগুলি প্রাসঙ্গিক মৌলিক বিবৃতি চান তা খুঁজে পেতে পারেন।

আমি সুপারিশ করছি যে আমরা সবাই এই প্রবন্ধটি অধ্যয়ন করি। আমি এটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছি। এটি চাইনিজ একাডেমি অফ সোশ্যাল সায়েন্সেসের অধ্যাপক মা ওয়েইক্সিয়ান চীনা ভাষায়ও অনুবাদ করেছেন।

ইয়াকোভলেভ বলেছেন যে ষড়যন্ত্র, যার মধ্যে তিনি অন্যতম নেতা ছিলেন, তা শুরু হয়েছিল ক্রুশ্চেভের 'গোপন বক্তৃতা' দিয়ে। ক্রুশ্চেভের ভাষণ ছিল জোসেফ স্ট্যালিনের উপর এক বিস্তৃত আক্রমণ।

আজ আমরা জানি যে ক্রুশ্চেভ মিথ্যা বলেছিলেন। ২০০৮ সালে আমি মস্কোতে রাশিয়ান ভাষায় একটি বই প্রকাশ করেছিলাম, যেখানে আমি দেখিয়েছিলাম যে স্ট্যালিনের দ্বারা বা ক্রুশ্চেভের ভাষণে ল্যাভরেন্তি বেরিয়ার দ্বারা করা প্রতিটি অপরাধ বা অপকর্মের অভিযোগ প্রমাণিতভাবে, পরীক্ষিতভাবে মিথ্যা। আমি এই ভাষণে ক্রুশ্চেভ কর্তৃক স্ট্যালিন এবং বেরিয়ার বিরুদ্ধে ৬১টি অভিযোগ চিহ্নিত করে শুরু করেছি।

২০০৮ সালের মধ্যে পাওয়া প্রাক্তন সোভিয়েত আর্কাইভ থেকে নথি ব্যবহার করে আমি দেখিয়েছি যে ক্রুশ্চেভের এই ৬১টি অভিযোগের মধ্যে কমপক্ষে ৪০টি ইচ্ছাকৃত মিথ্যা।

২০১১ সালে আমার বইটি ইংরেজিতে 'ক্রুশ্চেভ মিথ্যাচার' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর থেকে এটি চীনা-ফরাসি, জার্মান-ইতালীয় এবং চেকসহ এক ডজনেরও বেশি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

ক্রুশ্চেভ—স্ট্যালিন এবং তার কথিত 'অপরাধ' সম্পর্কে মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই বলেননি তার তাৎপর্য গভীর। এগুলিও মূলত অনাবিষ্কৃত। একটি বিষয় হলো, এটি দৃঢ়ভাবে ইঙ্গিত দেয় যে স্ট্যালিন কোনও অপরাধ করেননি! কারণ যদি স্ট্যালিন সত্যিই একটিও প্রকৃত অপরাধ করে থাকেন, তাহলে ক্রুশ্চেভ কেন তার সমস্ত মিথ্যার সাথে তার বক্তৃতায় এটি অন্তর্ভুক্ত করতেন না?

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকে প্রাক্তন সোভিয়েত আর্কাইভ থেকে বিপুল সংখ্যক নথি গবেষকদের কাছে উপলব্ধ রয়েছে। এর মধ্যে অনেক নথি রয়েছে যেখানে ১৯৩৬, ১৯৩৭ এবং ১৯৩৮ সালের তিনটি প্রকাশ্য মস্কো বিচারের আসামিদের সম্পর্কে প্রমাণ রয়েছে, সেইসাথে স্ট্যালিনের আমলে গ্রেপ্তার, দোষী সাব্যস্ত এবং মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আরও অনেক ব্যক্তির সম্পর্কে প্রমাণ রয়েছে।

এই নথিগুলি যা দেখায় তা হলো : ক্রুশ্চেভ এবং তার লোকেরা, এবং পরে গর্বাচেভ, ইয়াকোভলেভ এবং তাদের লোকেরা, স্ট্যালিনের নিজের এবং স্ট্যালিনের আমল সম্পর্কে সবকিছু মিথ্যা বলেছিলেন।

ক্রুশ্চেভ দিয়ে শুরু করা যাক। ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬-এর তার 'গোপন বক্তৃতার' পরে, অনেক পার্টি সদস্য, প্রধানত নেতারা, যাদের স্ট্যালিনের আমলে বিচার, দোষী সাব্যস্ত এবং মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল, তাদের 'পুনর্বাসিত' করা হয়েছিল।

'পুনর্বাসন' বলতে কী বোঝায়? এটি একটি অসৎ শব্দ যা প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। আমাদের উৎসাহিত করা হয়—বিভ্রান্ত করা হয়—যদি কোনও ব্যক্তিকে 'পুনর্বাসিত' করা হয়, তবে সেই ব্যক্তি সেই অপরাধের জন্য দোষী ছিলেন না যার জন্য তাকে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। তবে, এটি মোটেও সত্য নয়।

১৯৮০-এর দশকের গোড়ার দিকে কমিউনিস্ট-বিরোধী পণ্ডিতরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, 'পুনর্বাসন' ছিল একটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কাজ যার সাথে আইনি অপরাধ বা নির্দোষতার কোনও সম্পর্ক নেই। তার জার্মান ভাষার বই বুখারিনস রিহ্যাবিলিটিয়ারং-এ মার্ক জঙ্গে লিখেছেন :

...সোভিয়েত ইউনিয়নে পুনর্বাসন ছিল একটি স্বেচ্ছাচারী রাজনৈতিক-প্রশাসনিক কাজ, যা মূলত, ব্যবস্থাগুলির রাজনৈতিক সুবিধার দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল, ফৌজদারি আইন অনুসারে সঠিকতার দ্বারা নয়। (২৬৬)

আমাদের কাছে এখন যে বিপুল প্রমাণ আছে তা থেকে এটি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হওয়া গেছে। উদাহরণস্বরূপ, মস্কোর একটি মামলার আসামিকে 'পুনর্বাসন' করা হয়েছে, তার অর্থ এই নয় যে, এই ব্যক্তি আসলে যে কোনও অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন সে সম্পর্কে নির্দোষ ছিলেন।

ক্রুশ্চেভ মিথ্যাচারে আমি ২০০৫ সালে পাওয়া সমস্ত 'পুনর্বাসন' নথি নিয়ে আলোচনা করেছি। তাদের একটিতেও প্রমাণ নেই যে 'পুনর্বাসন' করা ব্যক্তি নির্দোষ ছিলেন। তারপর থেকে আমার মস্কোর সহকর্মী ভ্লাদিমির এল. ববরভ এবং আমি আরও অনেক 'পুনর্বাসন' প্রতিবেদন পরীক্ষা করেছি। তাদের কোনওটিতেই এমন কোনও প্রমাণ নেই যে 'পুনর্বাসন' করা ব্যক্তি আসলে সেই অপরাধ থেকে নির্দোষ ছিলেন যার জন্য তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

'পুনর্বাসন' এর অর্থ কেবল সোভিয়েত নেতৃত্ব–ক্রুশ্চেভ, তারপর গর্বাচেভ–রাজনৈতিক কারণে সেই ব্যক্তিকে নির্দোষ ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। 'রাজনৈতিক কারণ' ছিল জোসেফ স্ট্যালিনকে আক্রমণ করা এবং স্ট্যালিনের সময়ে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বারা করা কমিউনিজমের দিকে অগ্রগতিকে কালিমালেপন করা।

১৯৬১ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত বাইশতম পার্টি কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভের লোকেরা স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে আরও সহিংস আক্রমণ শুরু করে। আবারও, ওই কংগ্রেসের সময় স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি করা হয়েছিল তা মিথ্যা। তাদের কাছে প্রামাণ্য প্রমাণ ছিল যে, যাদের তারা নির্দোষভাবে দমন করা হয়েছিল বলে দাবি করেছিল তারা আসলেই দোষী ছিল এবং তারা ইচ্ছাকৃতভাবে এ বিষয়ে মিথ্যা বলেছিল।

উদাহরণস্বরূপ : ক্রুশ্চেভের কেজিবি (রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কমিটি) এর চেয়ারম্যান আলেকজান্ডার শেলেপিন 'তুখাচেভস্কি অ্যাফেয়ার'-এর অন্যতম আসামি কোমান্দার্ম (মেজর জেনারেল) ইয়োনা ইয়াকিরের স্ট্যালিনের কাছে লেখা একটি চিঠি পড়ে শোনান। শেলেপিন কেবল একটি অংশ পড়ে শোনান যেখানে ইয়াকির তার আনুগত্যের শপথ নেন। তিনি সেই অংশটি বাদ দিয়েছিলেন যেখানে ইয়াকির তার বিশ্বাসঘাতকতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার জন্য দীর্ঘ সময় ধরে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। আমি এবং আমার সহকর্মীরা ইয়াকিরের চিঠির পুরো অংশটি অনুবাদ করেছি এবং আমাদের ট্রটস্কি এবং সামরিক ষড়যন্ত্র বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ের একটি প্রতিলিপি পুনরুৎপাদন করেছি।

১৯৬২ সালে সিপিএসইউ-এর ইতিহাসবিদদের জন্য আয়োজিত এক সম্মেলনে, ক্রুশ্চেভের একজন অনুসারী, যিনি ক্রুশ্চেভের 'গোপন বক্তৃতা' তৈরি করেছিলেন, তিনি পার্টির ইতিহাসবিদদের বলেছিলেন যে, তাদের পার্টির আর্কাইভগুলিতে প্রবেশাধিকার দেওয়ার অনুমতি ছিল না। আজ আমরা জানি—সেই আর্কাইভগুলিতে থাকা নথি প্রমাণ করে যে ক্রুশ্চেভ এবং তার লোকেরা স্ট্যালিন সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলছিলেন।

বাইশতম কংগ্রেসের পর ক্রুশ্চেভ একটি বিশেষ কমিশন, 'শ্রেভেরনিক কমিশন-কে আর্কাইভগুলিতে অনুসন্ধান করার নির্দেশ দেন

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

সোভিয়েতের পতন : রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতা ও ঐতিহাসিক মিথ্যাচার

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

যাতে ক্রুশ্চেভ এবং তার লোকেরা স্তালিনের বিরুদ্ধে যে অপরাধের অভিযোগ করেছিলেন তার জন্য স্ট্যালিনকে দোষী প্রমাণ করার তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু শেরভেরনিক কমিশন এমন কোনও প্রমাণ খুঁজে পায়নি। প্রকৃতপক্ষে, তারা বিপরীত কিছু প্রমাণ পেয়েছে—উদাহরণস্বরূপ, প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মার্শাল তুখাচেভস্কি জাপানি জেনারেল স্টাফদের সাথে ষড়যন্ত্র করছিলেন! এই কমিশনের রিপোর্টগুলি ১৯৯৪-৯৫ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি, অর্থাৎ ইউএসএসআর-এর সমাপ্তির পর।

এখানে একটি মজার তথ্য আছে। বিশ বছর আগে ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস ঘোষণা করেছিল যে তারা তাদের 'অ্যানালস অফ কমিউনিজম' সিরিজের 'শ্যাভের্নিক কমিশন' রিপোর্টের একটি অনুবাদ প্রকাশ করবে। কিন্তু এই বইটি কখনও প্রকাশিত হয়নি। কেন?

আমি ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেসকে লিখেছিলাম এবং তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তারা কখনও আমার চিঠির উত্তর দেয়নি। কিন্তু আমি অনুমান করতে পারি, কেন ইয়েল এই বইটি প্রকাশ করেনি কারণ শ্যাভের্নিক কমিশন স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণিত সত্য খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছিল—অপবাদমূলক দাবি এবং অসমর্থিত দাবি নয়, বরং প্রমাণ। তবুও ক্রুশ্চেভ এবং তার গবেষকদের সমস্ত নথি, কেস ডায়েরি দেখার ও রেকর্ড রুমে প্রবেশাধিকার ছিল এবং তারা স্ট্যালিনের একটিও অপরাধের প্রকৃত প্রমাণ খুঁজে পায়নি। তাহলে ইয়েল কেন এমন একটি বই প্রকাশ করবে?

১৯৬২-১৯৬৪ সালে, ক্রুশ্চেভের ক্ষমতার শেষ বছরগুলিতে, স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে আরও অনেক অপরাধের অভিযোগ এনে প্রচুর বই এবং নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল এবং আরও অনেক ব্যক্তিকে 'পুনর্বাসিত' করা হয়েছিল। ১৯৬৪ সালের অক্টোবরে কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় ক্রুশ্চেভকে পদ থেকে অপসারণের পর স্ট্যালিনের বিরোধীদের পুনর্বাসন এবং আক্রমণ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে ক্রুশ্চেভের আক্রমণের অংশ হিসেবে প্রকাশনার উদ্দেশ্যে তৈরি কয়েকটি বই অনেক দেরিতে সম্পন্ন হয়েছিল এবং প্রকাশিত হয়নি। এরকম একটি বই হলো রই মেদভেদেভের লেখা *লেট হিস্ট্রি জাজ*। এটি পশ্চিমে পাচার করা হয়েছিল এবং প্রধান প্রকাশকদের দ্বারা অনেক ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। এটিও মিথ্যায় পূর্ণ এবং স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তার কোনও প্রাথমিক-উৎস তাতে নেই। সংক্ষেপে, সত্যে আগ্রহীদের জন্য এটি মূল্যহীন। কিন্তু এটি কমিউনিস্ট-বিরোধী, অসৎ অথবা অযোগ্য ছদ্ম-পণ্ডিতদের কাছে এবং ট্রটস্কিবাদীদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান প্রমাণিত হয়েছে, যারা ৬০ বছর পরেও আজও এটি উদ্ধৃত করে আসছে।

১৯৮৫ সালের মার্চ মাসে মিখাইল গর্বাচেভ সিপিএসইউর প্রথম সচিব নির্বাচিত হন। গর্বাচেভ এবং ইয়াকভলেভ তাৎক্ষণিকভাবে স্ট্যালিনের উপর এমন এক স্তরে আক্রমণ শুরু করেন যা ক্রুশ্চেভের মিথ্যা ও অপবাদ প্রচারণাকেও ছাড়িয়ে যায়।

আজ আমাদের কাছে প্রাক্তন সোভিয়েত আর্কাইভ থেকে প্রচুর পরিমাণে প্রমাণপত্রাদি সহজলভ্য হয়েছে। এগুলি যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে ক্রুশ্চেভ-যুগ এবং গর্বাচেভ-ইয়াকোভলেভ যুগের স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে 'অপরাধের' অভিযোগগুলি সবই মিথ্যা—এর অর্থ হল স্ট্যালিনের আমলে সোভিয়েত ইউনিয়নের মূলধারার, একাডেমিক ইতিহাসের প্রায় সমস্ত, সেইসাথে ট্রটস্কিপন্থি, সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট, নৈরাজ্যবাদী এবং অন্যান্য কমিউনিস্ট বিরোধীদের সমস্ত বই এবং নিবন্ধ অসত্য তথ্যের উপর ভিত্তি করে—সরল ভাষায়, এগুলি সবই মিথ্যা।

স্টালিনের বিরুদ্ধে অভিযোগের কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হলো যা আমার সহকর্মীরা এবং আমি মিথ্যা প্রমাণ করেছি :

♦ ১৯৪৮ সালের জানুয়ারিতে সোভিয়েত ইহুদি থিয়েটার পরিচালক সলোমন মিখোয়েলসকে হত্যা করাননি স্ট্যালিন। এটি একটি মিথ্যা, যা স্থূল জালিয়াতির উপর দাঁড়িয়ে। আমার সহ-লেখক মস্কোর ভ্লাদিমির এল. ববরভ এবং আমি আমাদের বই *স্ট্যালিন এক্সোনেরেটেড। ফ্যাক্ট-চেকিং দ্য ডেথ অফ সলোমন মিখোয়েলস*-এ এটি আমি প্রমাণ করি।

♦ মার্শাল তুখাচেভস্কি এবং ১৯৩৭ সালের জুনে বিচারে দোষী সাব্যস্ত এবং মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ সামরিক কমান্ডাররা সকলেই দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে প্রচুর প্রমাণ রয়েছে। এছাড়াও, তাদের বিচারের সম্পূর্ণ প্রতিলিপি ২০১৮ সালে অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছিল। আমাদের বই, *ট্রটস্কি অ্যান্ড দ্য মিলিটারি কনস্পিরেসি*-তে এসব প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং এটিই যেকোনো ভাষায় এই বিচারের প্রতিলিপির একমাত্র সম্পূর্ণ অনুবাদ।

♦ সামরিক ষড়যন্ত্রকারীরা ডানপন্থি এবং ট্রটস্কিপন্থি বিরোধীদের সাথে জোটবদ্ধ ছিল, যার মধ্যে আলেক্সি রাইকভ, নিকোলাই বুখারিন এবং অন্যান্য কম পরিচিত ছিলেন। তারা সরাসরি লিওন ট্রটস্কির সাথেও ষড়যন্ত্র করছিল।

♦ লেনিন ১৯২২ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯২৩ সালের মার্চ পর্যন্ত লেখা কোনও প্রবন্ধ লেখেননি—যাকে মিথ্যাভাবে 'লেনিনের টেস্টামেন্ট' বলা হয়—যেখানে স্ট্যালিনের সমালোচনা করা হয়েছে এবং ট্রটস্কির প্রশংসা করা হয়েছে। এই প্রবন্ধগুলি ট্রটস্কি, তারপর ক্রুশ্চেভ 'সিক্রেট স্পিচ'-এ স্ট্যালিনকে অপমান করার জন্য ব্যবহার করেছেন। এটি রাশিয়ান ইতিহাসবিদ ভ্যালেন্টিন সাখারভ আবিষ্কার করেছিলেন, যিনি ১৯৯০-এর দশকে লেনিনের আর্কাইভে থাকা মূল নথিগুলিতে আংশিক দেখার অনুমতি পেয়েছিলেন। রাশিয়ান ভাষায় লেখা তার ৭০০ পৃষ্ঠার বই, লেনিনের 'পলিটিক্যাল টেস্টামেন্ট', আমার বই *দ্য ফ্রড অফ দ্য টেস্টামেন্ট অফ লেনিন*-এ উল্লেখ রয়েছে।

♦ প্রাথমিক উৎসগুলির অধ্যয়ন থেকে দেখা যায় যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন 'ক্যাটিন গণহত্যা' নামক ঘটনায় পোলিশ বন্দিদের গুলি করেনি। প্রমাণের জন্য, আমার বই *ক্যাটিন গণহত্যা রহস্য*, দেখুন। গর্বাচেভের তৈরি করা নথিগুলি যা সোভিয়েত অপরাধবোধ প্রতিষ্ঠা করে তা জাল, যার মধ্যে কিছু ক্রুশ্চেভের সময় থেকে উদ্ভূত।

♦ ১৯৩৭-১৯৩৮ সালের তথাকথিত 'মহা সন্ত্রাস'-যা রাশিয়ায় আরও সঠিকভাবে 'ইয়েজোভশ্চিনা' বা 'ইয়েজোভের খারাপ সময়' নামে পরিচিত–এর সাথে জড়িত ছিল NKVD-এর প্রধান (কমিসার) নিকোলাই ইয়েজোভ কর্তৃক অসংখ্য নিরীহ মানুষকে হত্যা করা। প্রমাণগুলি এটাই দেখায়, যেমনটি আমি আমার বই *ইয়েজোভ বনাম স্ট্যালিনে* উল্লেখ করেছি। এই বইতে ইউএসএসআর-এ গণদমন এবং তথাকথিত 'মহা সন্ত্রাস' সম্পর্কে সত্যিকারের ইতিহাস আছে। 'মহা সন্ত্রাস' শব্দটি কমিউনিস্ট বিরোধী প্রচারক এবং ব্রিটিশ গোয়েন্দা এজেন্ট রবার্ট কনকোয়েস্ট দ্বারা উদ্ভাবিত হয়েছিল, যার বিশাল বইটিতে তার যুক্তি সমর্থন করার জন্য কোনও প্রমাণ নেই যে স্ট্যালিনই এই হত্যাকাণ্ডের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ইয়েজোভ স্ট্যালিন এবং পলিটব্যুরোকে প্রতারণা করেছিলেন, যারা ধরে নিয়েছিলেন যে NKVD প্রকৃত বিদ্রোহের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। যখন স্ট্যালিন এবং অন্যরা আবিষ্কার করলেন যে ইয়েজোভ নিরীহ মানুষকে হত্যা করছেন, তখন ইয়েজোভকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাদের বেশিরভাগেরই, যার মধ্যে ইয়েজভ নিজেও ছিলেন, ১৯৪০ সালের জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারিতে বিচারে, দোষী সাব্যস্ত এবং মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল।

♦ ১৯৩২-৩৩ সালের দুর্ভিক্ষ কৃষির সমষ্টিগতকরণের মাধ্যমে তৈরি হয়নি। ইউক্রেনীয় জাতীয়তাবাদীরা এবং আরও অনেকে যেমন দাবি করে আসছেন যে, স্ট্যালিন ইচ্ছাকৃতভাবে 'ইউক্রেনকে শাস্তি দেওয়ার জন্য' এটি তৈরি করেছিলেন, তা তো দূরের কথা। 'হলোডোমোর' বা 'মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ'-এর পুরো ধারণাটিই একটি প্রতারণা। এর কোনও প্রমাণ কখনও পাওয়া যায়নি।

দুর্ভিক্ষের প্রাকৃতিক কারণ ছিল: কিছু এলাকায় বন্যা, অন্য এলাকায় খরা, মরিচা এবং ধূলিকণার মতো উদ্ভিদ রোগ এবং পোকামাকড় এবং ইঁদুরের উপদ্রব। সোভিয়েত নেতৃত্ব দুর্ভিক্ষের পরিমাণ আবিষ্কার করার পর, সোভিয়েত সরকার দেশের ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলিকে ব্যাপক সহায়তা প্রদান করে। এর ফলে দুর্বল কৃষকরা, যাদের সংখ্যা অনাহারে মৃত্যু এবং অসুস্থতার কারণে হ্রাস পেয়েছিল, ১৯৩৩ সালে ভালো ফসল ফলাতে সক্ষম হয়েছিল এবং দুর্ভিক্ষের অবসান ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল।

দুর্ভিক্ষটি ইউক্রেনীয় SSR-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, যেমনটি ইউক্রেনীয় জাতীয়তাবাদীরা মিথ্যা দাবি করে। এটি রাশিয়া এবং বিশেষ করে কাজাখস্তানের অঞ্চলগুলিকে প্রভাবিত করেছিল। এই বিষয়ে এবং সোভিয়েত কৃষিক্ষেত্রের উপর সাধারণত সেরা গবেষণাটি পশ্চিম ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্ক টাগারের। আমি আমার *ব্লাড লাইস* বইয়ের দুটি অধ্যায়ে এবং *স্ট্যালিন ওয়েটিং ফর... দ্য ট্রুথ'* বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে টাগারের গবেষণার সারসংক্ষেপ তুলে ধরেছি।

♦ লিওন ট্রটস্কির আসলেই কমিন্টার্নের মধ্যে একটি গুরুতর ষড়যন্ত্র ছিল। এই ষড়যন্ত্রে কমিন্টার্নের প্রাক্তন নেতা ওসিপ পাইটনিটস্কি, হাঙ্গেরিয়ান কমিউনিস্ট নেতা বেলা কুন, বিশিষ্ট জার্মান কমিউনিস্ট হ্যান্স নিউম্যান এবং আরও অনেকে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আমরা আমাদের *ট্রটস্কির কমিন্টার্ন ষড়যন্ত্র* বইয়ের প্রমাণগুলি অধ্যয়ন এবং অনুবাদ করেছি।

♦ মস্কো ট্রায়ালে লিওন ট্রটস্কির বিরুদ্ধে আরোপিত সমস্ত অভিযোগ শক্তিশালী প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত। ট্রটস্কি প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জার্মান গেস্টাপো, জার্মান সামরিক বাহিনী এবং জাপানি সামরিক বাহিনীগুলির সাথে সহযোগিতা করেছিলেন। প্রমাণগুলি জাল করা যায় না। এর অনেক কিছুই বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া যায়।

আমার সর্বশেষ বইটি ট্রটস্কির নিকটতম বন্ধু এবং রাজনৈতিক মিত্রদের একজন খ্রিস্টিয়ান রাকোভস্কির উপর। রাকোভস্কি প্রকৃতপক্ষে জাপানে ট্রটস্কির এজেন্ট এবং একজন জাপানি গুপ্তচর ছিলেন।

♦ ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে ট্রটস্কি 'ডিউই কমিশন'-এর কাছে মিথ্যা বলেছিলেন। কমিশন শুনানি করে ঘোষণা করেছিল যে ট্রটস্কিকে প্রথম দুটি মস্কো বিচারের মাধ্যমে ফাঁসানো হয়েছে, যদিও এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে তাদের কাছে কোনও প্রমাণ ছিল না। তাছাড়া, ট্রটস্কি ডিউই কমিশনের কাছে নির্লজ্জভাবে মিথ্যা বলেছিলেন। ১৯৮০ সালের জানুয়ারিতে গবেষকদের জন্য উন্মুক্ত হার্ভার্ড ট্রটস্কি আর্কাইভের নথি থেকে আমরা এটি প্রমাণ করতে পারি। আমার ছোট বই *দ্য ফ্রড অফ দ্য ডিউই কমিশন* দেখুন।

ট্রটস্কি এবং তার মিথ্যাচার এবং মিথ্যাচার সম্পর্কে আমি এখন ছয়টি বই প্রকাশ করেছি। ট্রটস্কি এমনভাবে মিথ্যা বলেছিলেন যা বিশ্বাসযোগ্য নয়—যতক্ষণ না আমরা মনে করি যে ট্রটস্কি স্ট্যালিন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের একটি নেটওয়ার্কে জড়িত ছিলেন এবং মিথ্যা বলা যেকোনো ষড়যন্ত্রের একটি অপরিহার্য কৌশল। আজকের ট্রটস্কিপন্থিরা, অতীতের ট্রটস্কিপন্থিদের মতো, আমাদের কাছে থাকা প্রমাণগুলিকে উপেক্ষা করে এবং স্ট্যালিন সম্পর্কে মিথ্যাচারগুলিকে আঁকড়ে ধরে থাকে, কারণ এই মিথ্যাচারগুলি ট্রটস্কি সম্প্রদায়কে টিকিয়ে রাখে।

ক্রুশ্চেভের জানা উচিত ছিল যে, তিনি এবং তার লোকেরা স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছিলেন তা মিথ্যা ছিল। একইভাবে, ক্রুশ্চেভের 'গোপন বক্তৃতা' শুনেছিলেন এমন অনেক পার্টি নেতা অবশ্যই জানতেন যে ক্রুশ্চেভ যা বলেছিলেন তার অন্তত কিছু মিথ্যা ছিল। তারা চুপ করে রইলেন। কিন্তু একটি তরুণ প্রজন্ম তাকে বিশ্বাস করেছিল। ইয়াকোভলেভ স্পষ্টতই ক্রুশ্চেভ-যুগের মিথ্যা বিশ্বাস করেছিলেন। মিখাইল গর্বাচেভও তাই করেছিলেন। গর্বাচেভ লিখেছেন– '... ধারণাটি আসলে ছিল সেই সর্বগ্রাসী দানবের কোমর ভেঙে ফেলা...সেই দলীয়-রাষ্ট্র কাঠামো যা সমগ্র সমাজকে, প্রতিটি ব্যক্তিকে, বশীভূত করতে এবং শোষণ করতে চেয়েছিল।'

গর্বাচেভ এবং তার অনুসারীরা জানতেন যে তাদের তথাকথিত 'সংস্কার' সোভিয়েত জনগণের জন্য বিরাট কষ্টের কারণ হবে। তারা তাতে কিছু মনে করেননি। ১৯৯০ সালে গর্বাচেভ প্রাভদা-তে লিখেছিলেন—'...আমি অনুপ্রাণিত যে, বর্তমান প্রজন্ম, অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে এবং বর্তমানের বাস্তবতা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে, এই পথে আমাদের জন্য অপেক্ষা করা অবিশ্বাস্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং মানসিক সমস্যাগুলি সত্ত্বেও, একটি মৌলিকভাবে নতুন সামাজিক-ঐতিহাসিক সমাধানের দায়িত্ব নেওয়ার শক্তি পেয়েছে। মূল সমস্যাগুলিসহ সবকিছু এখনও এগিয়ে রয়েছে।'

ভিটালি ইভানোভিচ ভোরোটনিকভ ছিলেন একজন উচ্চপদস্থ দলীয় কর্মকর্তা, অবশেষে মন্ত্রী পরিষদের চেয়ারম্যান, তারপর সুপ্রিম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়ামের চেয়ারম্যান। গর্বাচেভের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ভোরোটনিকভ লিখেছেন—'পেরেস্ত্রোইকার প্রধান নায়ক, এম. এস. গর্বাচেভ, ১৯৯২ সালের মাঝামাঝি থেকে তার সাক্ষাৎকারে, নির্লজ্জভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি শুরু থেকেই সমগ্র 'গণতান্ত্রিক বিপ্লব' [তথাকথিত–জিএফ] পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু তা গোপন করেছিলেন...অন্যথায়, তিনি ঘোষণা করেন, 'যদি আমি তখন চূড়ান্ত লক্ষ্য ঘোষণা করতাম, তাহলে আমি অনিবার্যভাবে উৎখাত হতাম।' এই ধরনের বক্তব্য দেওয়ার জন্য নিজের দেশ এবং জনগণের সাথে কোন ভয়াবহ নিন্দাবাদের দিকে পৌঁছাতে হবে?'

ফিলিপ ডেনিসোভিচ ববকভ ছিলেন একজন সোভিয়েত জেনারেল এবং উচ্চপদস্থ কেজিবি কর্মকর্তা। ববকভ লিখেছেন–'গর্বাচেভ কি এতটাই নির্বোধ ছিলেন যে তিনি বুঝতে পারেননি যে দেশের জীবনে কী ধরণের উত্থান ঘটছে? না...পেরেস্ত্রোইকার শুরু থেকেই সবকিছু চিন্তাভাবনা করে এবং তাড়াহুড়ো না করে করা হয়েছিল। আমাদের নেতারা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন : যদি তারা অবিলম্বে তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ঘোষণা করত–সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিস্থাপন করা এবং কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে দেওয়া–এর ফলে জনমনে কী ধরণের ক্ষোভের সৃষ্টি হতো তা কল্পনা করা কঠিন নয়।'

ইতিহাসবিদ এবং গর্বাচেভের অন্যতম শীর্ষ সহযোগী আনাতোলি সের্গেভিচ চেরনিয়াভ গর্বাচেভের নীতিগুলিকে সমর্থন করেছিলেন। তবুও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে সেগুলি কতটা ধ্বংসাত্মক হবে। ১৯৯০ সালের ১৫ নভেম্বর তারিখের তার প্রকাশিত ডায়েরিতে চেরনিয়াভ নিম্নলিখিত লেখাটি লিখেছেন–

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

কমরেড শাহজাহান তালুকদার ও খায়ের ইমতিয়াজ মাসউদ দাউদের প্রয়াণে শোকসভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে দলের কেন্দ্রীয় পাঠচক্র ফোরামের সদস্য—চাঁদপুর জেলা সমন্বয়ক কমরেড শাহজাহান তালুকদার এবং নোয়াখালী জেলা সমন্বয়ক কমরেড খায়ের ইমতিয়াজ মাসউদ দাউদের প্রয়াণে শোকসভা ২৭ অক্টোবর '২৫ সেগুনবাগিচাস্থ ভ্যানগার্ড মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শোকসভায় বক্তব্য রাখেন সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নিখিল দাস, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জুলফিকার আলী, শ্রমিক ফ্রন্টের সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান লিপন, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সহসভাপতি শাহজাহান কবীর, সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি মুক্তা বাড়ৈ।

শোকসভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, ১৭ অক্টোবর নোয়াখালীতে কমরেড দাউদ ও ২২ অক্টোবর চাঁদপুরে কমরেড শাহজাহান তালুকদার প্রয়াত হন। আমাদের এই দুই কমরেডের আকস্মিক মৃত্যুতে দলের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে এবং শ্রমজীবী মানুষ হারিয়েছে তাদের লড়াইয়ের অকৃত্রিম বন্ধুকে।

শোকসভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, কমরেড দাউদ ছিলেন একটি রাজনৈতিক, শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবক পরিবারে সন্তান। তাঁর পিতা-চাচা ও বড়ভাই সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন—তাঁর চাচা এবং বড় ভাই উভয়েই জাসদ রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। তাদের সংস্পর্শেই তিনি জাসদ রাজনীতির সাথে যুক্ত হন এবং ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাসদ রাজনীতিতে যুক্ত হন। তিনি প্রথমে লক্ষ্মীপুর জেলার সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন এবং পরবর্তীতে নোয়াখালী জেলার সমন্বয়কের দায়িত্ব আমৃত্যু পালন করেন। লক্ষ্মীপুরে আমাদের দল বাসদের নেতৃত্বে নদীভাঙন রোধ ও জলাবদ্ধতা নিরসনের আন্দোলন, ভূমিহীন কৃষকদের জমির অধিকার আদায়ের সংগ্রাম, মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সফল আন্দোলন সংগঠিত হয়। তিনি এইসকল আন্দোলনের সামনে থেকে সাহসের সাথে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। দলের প্রতি তাঁর ছিল আস্থা ও ভালোবাসা। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি দলের সাথে যুক্ত থেকে দায়িত্ব পালন করেন। লক্ষ্মীপুর এবং নোয়াখালী উভয় জেলার পার্টি অফিস তাঁর নিজস্ব জায়গায়, এর জন্য তিনি ভাড়া নিতেন না। দলের সংকট মুহূর্তে, যখন নোয়াখালীতে দলীয় কর্মী সংখ্যা সীমিত হয়ে পড়েছিল, তখন তিনি দলের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে ছিল সমালোচনা মেনে নেওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা।

কমরেড শাহজাহান তালুকদার সম্পর্কে নেতৃবৃন্দ বলেন, তিনি ছিলেন দলের প্রতি একনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য মানুষ। তাঁর জীবন কষ্টকর সংগ্রাম ও ত্যাগের এক অনন্য নজির। তিনি পার্টির সম্পদ রক্ষায়, আর্থিক তহবিল পরিচালনায় অসামান্য সততা ও দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন। পার্টির প্রকাশনা বিক্রির অর্থ নির্ধারিত সময়ে পার্টির তহবিলে জমা দিতেন এবং অর্থ-সম্পদ ব্যবস্থাপনায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে দলের অর্থ ব্যবহার করতেন না। এক কথায় আর্থিক বিষয়ে তাঁর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ছিল অনুকরণীয়। তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থেই পার্টি-অন্তঃপ্রাণ। তাঁর সমস্ত চিন্তা-ভাবনা, কাজ-কর্ম এবং জীবনযাপনের কেন্দ্র ছিল দলের স্বার্থে পরিচালিত। দৈনন্দিন জীবনের কঠিন পরিস্থিতিতেও তিনি কখনো দলের কাজ ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি।

এই দুই কমরেডের জীবন ও সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয় আমাদের জন্য রয়েছে। আমাদের পার্টির জীবনে যেমন লড়াই-সংগ্রামের অনেক ইতিহাস আছে, তেমনি দুঃখকষ্ট ও বেদনারও ইতিহাস আছে। কাছের মানুষ যখন হারিয়ে যায়, তখনই আমরা বুঝতে পারি তাদের শূন্যতা কতটা গভীর। মৃত্যু যেমন বেদনা বয়ে আনে, সেইসাথে রেখে যায় গভীর এক শিক্ষা।

আমাদের ভাবতে হবে, যারা বেঁচে আছেন

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

একটা রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের পরও দেশে লুটপাটের রাজনীতি বন্ধ হয়নি

বাসদ হবিগঞ্জ জেলা সম্মেলনে

কমরেড খালেকুজ্জামান

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা কমরেড খালেকুজ্জামান সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, দেশে স্বাধীনতার ৫৪ বছরের রাজনৈতিক শাসন, আর্থব্যবস্থা, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক জীবনধারা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার ইতিহাস জনগণের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করে গণবিরোধী শাসন-প্রশাসন পরিচালনার ইতহাস। স্বাধীনতার ৮ বছর পর আমাদের দল বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত দলের ইতিহাস গণবিরোধী শাসনের প্রতি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে অবিরাম আন্দোলন সংগ্রাম ও গণসচেতনতা তৈরির ইতিহাস। বাংলাদেশের মুক্তির জনযুদ্ধ স্বাধীনতা যুদ্ধকে আওয়ামী লীগ পারিবারিক যুদ্ধ বানিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে লাঞ্ছিত করেছে, গণ আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করেছে।

এখন আবার স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিসমূহ ও তাদের সাথে বাজনা-বাদ্য বাজানো সহযোগিরা মিলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে কালিমালিপ্ত করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের মূল আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত না হওয়ার অপূরিত স্বপ্ন থেকেই বারে বারে গণবিস্ফোরণ, গণ অভ্যুত্থান সংগঠিত হচ্ছে। এবারের গণ অভ্যুত্থানও তার ব্যতিক্রম নয়। সে কারণে এ অভ্যুত্থানের চেতনা হিসাবে প্রকাশিত এবং ভাস্বর হয়ে উঠেছিল বৈষম্যবিরোধী চেতনা। কিন্তু দেড় বছরের মাথায় এসে ব্যবস্থা বদলের পরিবর্তে একই শ্রেণির হাত বদলের কারণে হতাশার গোলকধাধায় মানুষ দিশেহারা। মানুষের জীবনের নিরাপত্তা ও নারীর সম্ভ্রম কচুপাতার পানির মতো টলমল অনিশ্চিত। দ্রব্যমূল্যের কষাঘাতে জীবন অতিষ্ঠ। পাকিস্তান আমলে একটি পোস্টার ছাপা হয়েছিল, সোনার বাংলা শ্মশান কেন? তখন জবাব ছিল পাকিস্তানি উপনিবেশিক শাসনের অধীনে পূর্ব পাকিস্তানের উপর পাকিস্তানি শাসক শোষকদের নির্মম শোষণ ও নির্দয় শাসন। আজ স্বাধীনতার ৫৪ বছর পর প্রশ্ন জাগে স্বাধীন বাংলাদেশ ছারখার কেন? জবাব বাংলাদেশি শাসকদের শোষণ-লুন্ঠন। ৫৪ বছরে ১২টি জাতীয় নির্বাচন হয়েছে। গণতন্ত্র হয়নি, শেষণমুক্তি ঘটেনি। গণতন্ত্রের ছোয়া বিজলি চমকের মতো ক্ষণিকের দেখা দিলেও স্থায়িত্ব পায়নি। এবার ১৩ নম্বরের নির্বাচনের হাল কতটা বেহাল হবে তা এখনই পরিমাপ করা কঠিন। এ অবস্থার মোড় ফিরাতে আমরা লড়ছি। গণমানুষের পক্ষে শ্রমজীবী জনগণের পক্ষে দাঁড়াতে গিয়ে আমাদের উপর বার বার আঘাত আসছে। কিন্তু আমরা অবদমিত নই। গত ১৬ এপ্রিল '২৫ গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সেলিম মাহমুদসহ ২২ জন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়। একইভাবে ২৯ এপ্রিল চট্টগ্রামে বাসদ জেলা ইনচার্জ কমরেড আল-কাদেরী জয়, ছাত্র ফ্রন্ট জেলা শাখার সভাপতি কমরেড মিরাজ উদ্দিন ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিবদ নেতা রোকনকে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার ও সম্প্রতি ২৭ সেপ্টেম্বর বাসদ সিলেট জেলা শাখার আহ্বায়ক আবু জাফর ও জেলা সদস্যসচিব প্রণব জ্যোতি পাল জেলা পার্টি অফিস থেকে গ্রেপ্তার হয়ে ১ মাস কারাভোগের পর জামিনে মুক্তি পেয়েছে। সর্বশেষ ১ নভেম্বর সিলেটে দ্বিতীয় দফা বাসদ অফিসে ব্লক রেইড দিয়ে পাঠচক্র করা অবস্থায় ২২ জন শ্রমিক ফ্রন্ট কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ১৫ জন এখনও কারাগারে। এরপরও আমাদের আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। শোষণ ও বৈষম্যমুক্ত সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের সকল বাম গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তিকে সাথে নিয়ে আমরা বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাব। আজকের সম্মেলন হবিগঞ্জের প্রগতিবাদী সকল মানুষের মনে প্রাণে আশা জাগাবে, আমরাও নতুন প্রাণ শক্তিতে দাঁড়াব। এই সম্মেলনে হবিগঞ্জবাসী যারা যতটুকু সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে, সকল কর্মে অংশ নিয়ে সম্মেলনকে সফল করার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছেন, তাদের সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং এই সম্মেলনের সফলতা কামনা করে আমি সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

১৬ নভেম্বর হবিগঞ্জ শহরের আরডি হল প্রাঙ্গণে বাসদ-এর ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, রুশ বিপ্লবের ১০৮তম বার্ষিকী ও জেলার প্রথম সম্মেলন উদ্বোধন করেন কমরেড খালেকুজ্জামান। জেলা বাসদের সমন্বয়ক কমরেড অ্যাড. জুনায়েদ আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, জেলা বাসদের সাবেক সমন্বয়ক কমরেড আবুল কালাম আজাদ, জেলার সদস্য নূরুল হুদা চৌধুরী শিবলী, সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক ফয়সাল আহমেদ, সদস্য নুরুজ্জামান তরফদার প্রমুখ। এছাড়াও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কমিউনিস্ট পার্টি জেলা শাখার সভাপতি কমরেড পীযূষ চক্রবর্তী, বাসদ সিলেট জেলা শাখার সমন্বয়ক কমরেড আবু জাফর, চুনারুঘাট উপজেলা শাখার সদস্যসচিব মুজিবুর রহমান ফরিদ, বানিয়াচং উপজেলা শাখার আহবায়ক এআরসি কাওছার, সাবেক সমন্বয় লোকমান তালুকদার, অটোরিকশা শ্রমিক ফেডারেশন হবিগঞ্জ জেলার সহসভাপতি সামসুর রহমানসহ বিভিন্ন উপজেলা শাখা ও ইউনিটের নেতৃবৃন্দ। সভা সঞ্চালনা করেন শ্রমিক নেতা কমরেড শফিকুল ইসলাম।

উদ্বোধনী পর্বের পর এক বিশাল লাল পতাকা মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে আরডি হল প্রাঙ্গণে ফিরে আসে। মিছিল শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

সমাবেশে শেষে কাউন্সিলে নবনির্বাচিত কমিটি পরিচয় করিয়ে দেন কমরেড খালেকুজ্জামান। কমিটির আহ্বায়ক নুরুজ্জামান তরফদার, সদস্যসচিব শফিকুল ইসলাম, সদস্য অ্যাড. জুনায়েদ আহমেদ, নূরুল হুদা চৌধুরী শিবলী, আব্দুল কুদ্দুস মজুমদার, ফয়সাল আহমেদ, মোশারফ হোসেন খান শান্ত, দীপক দত্ত, ডা. সুনীল রায়, মুজিবুর রহমান ফরিদ, অ্যাড. জিলু মিয়া, লোকমান তালুকদার ও এমদাদুর রহমান কাউসার।

কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেন, '২৪ সালেও দেশের ছাত্র-শ্রমিক, জনতার বুকের রক্তে অভ্যুত্থান সফল করার পর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত অন্তর্বর্তী সরকার গণমানুষের স্বার্থের বদলে সংবিধান, গণভোট ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় বিতর্কে মানুষের দুঃখ-কষ্ট ঢেকে দিয়ে নিজেদের ভাগ্য গড়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। যেন অতীতের স্বৈরাচারী সরকারের সাথে পাল্লা দিয়ে নিজেদের দায়িত্ব শেষ করছেন তারা।

ব্যবস্থা বদলের পরিবর্তে একই শ্রেণির কাছে ক্ষমতার হাত বদলের কারণে গণমানুষের জীবনমানের পরিবর্তন ঘটছে না। তাই বুর্জোয়া ও লুটেরা রাজনীতির বৃত্তের বাইরে গণঅভ্যুত্থানের আকাক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমাজতন্ত্রের সংগ্রামকে জয়যুক্ত করতে হবে।

মামদানির জয় এবং তারপর

আমেরিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর নিউইয়র্ক। আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি যতটা পরিচিত তার চাইতে নিউইয়র্ক কম পরিচিত নয়। সম্প্রতি এই শহরের মেয়র নির্বাচন সারাবিশ্বে আলোচনার ঝড় তুলেছে। মেয়র হিসেবে যিনি বিজয়ী হয়েছেন তাকে নিয়েও চলছে তোলপাড়। খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প—নির্বাচন নিয়ে শতর্কতামূলক মন্তব্য করছেন, ক্ষোভ ঝেড়েছেন, এমনকি মেয়র হিসেবে জোহরান মামদানির বিজয়ে হতাশাও প্রকাশ করেছেন। মামদানি ডেমোক্রেটিক পার্টির সদস্য। ১৮২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই পার্টির নির্বাচনী প্রতীক হলো গাধা। নিউইয়র্কের ১১১তম মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন মামদানি। আমেরিকা একটি নিয়মিত নির্বাচনের দেশ। সময়মতো এবং নিয়মিত নির্বাচন হয় এই দেশে। ১১০তম মেয়রও ছিলেন একজন ডেমোক্রেট। তাহলে এই নির্বাচন এবং মামদানিকে নিয়ে সারা বিশ্বের এতো উত্তেজনা, বিতর্ক এবং আগ্রহ কেন?

নির্বাচন নিয়ে এই আলোড়ন সৃষ্টির কারণ জোহরান মামদানি ঘোষণা করেছেন যে—তিনি একজন ডেমোক্রেটিক সোশালিস্ট। এর সাথে যুক্ত হয়েছে তার নির্বাচনী বক্তব্য এবং পরিচয়। যদিও পরিকল্পিতভাবে তার ধর্মীয় পরিচয়কে সামনে আনা হয়েছে কিন্তু এটিই তার নির্বাচিত হওয়ার মূল কারণ নয়। তিনি প্রধানত দরিদ্র মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গ, নারী-পুরুষ, ট্রান্সজেন্ডার, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, খ্রিষ্টান-মুসলিম, ইহুদি-বৌদ্ধ-সনাতন সকল ধর্মের মানুষ, শিশু-নারী, বৃদ্ধ, বেকার ও কর্মহীন, গৃহহীন সকল মানুষই নাগরিক। তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা তার কাছে মুখ্য। এসব ছাড়াও তার সমাজতন্ত্রের প্রতি সমর্থন, যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত গাজা এবং প্যালেস্টাইনের জনগণের পাশে দাঁড়ানো। নিউইয়র্কের বাসিন্দাদের সংকট সমাধানে উদ্যোগ নেওয়ার ঘোষণা এবং ধনীদের উপর ট্যাক্স বাড়ানোর পরিকল্পনার কথা কিছুটা আড়াল করতেই শুধুমাত্র তাঁর ধর্মীয় পরিচয় সামনে আনা হয়েছে। নিউইয়র্কে মুসলিম জনগোষ্ঠী মাত্র ৯ শতাংশ এবং তারাও বহুধা বিভক্ত। ফলে শুধু মুসলিম ভোটের উপর নির্ভর করে কোন প্রার্থীর জিতে আসা অসম্ভব। ৮৬ লাখ অধিবাসীর নিউইয়র্ক শহরে ভোটার সংখ্যা প্রায় ৫০ লাখ এবং ভোট দিয়েছেন প্রায় ১৭ লাখ ভোটার। মামদানি ভোট পেয়েছেন প্রদত্ত ভোটের ৫৪ শতাংশ এবং তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়েছেন ৪১ শতাংশ ভোট।

এটা তো সবাই জানেন তার মা প্রখ্যাত ভারতীয় চিত্রপরিচালক মীরা নায়ার। তাঁর প্রযোজনা সংস্থার নাম মীরাবাঈ ফিল্মস। সালাম বোম্বে, মুনসুন ওয়েডিং, কামসূত্র, নেমসেক তাঁর পরিচালিত ছবিগুলোর মধ্যে অন্যতম। তাকে ভারতের অন্যতম সম্মানসূচক পুরস্কার পদ্মভূষণ প্রদান করা হয়। মীরা নায়ারের সন্তান জোহরান মামদানির জন্ম উগান্ডার রাজধানী কাম্পালায়, ১৯৯১ সালের ১৮ অক্টোবর। সদ্য ৩৪ বছরে পা দেওয়া এই রাজনীতিকের বাবা মাহমুদ মামদানি ভারতে জন্ম নেওয়া একজন উগান্ডান শিক্ষাবিদ। তার স্ত্রী রামা দুওয়াজি একজন শিল্পী, গ্রাফিক আর্টস ডিজাইনার। মামদানির ৭ বছর বয়সে তার বাবা-মা আমেরিকায় স্থায়ী হন। এটুকু জানা থাকলে মামদানির সম্পর্কে সব জানা হয় না। মামদানির কাজই তাকে নাগরিকদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। সে কারণেই ১৯৬৫ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়ে বিজয়ী হওয়া মেয়র তিনি। জোহরান মামদানির প্রাপ্ত ভোট ১০ লাখ ৩৩ হাজার ৪৭১।

মামদানি নিউইয়র্কের প্রায় সব জাতি-গোষ্ঠীর ভোট পেয়েছেন, শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ, লাতিনো, এশীয় ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর ভোটাররা তাকে বেছে নিয়েছেন। বয়সে তরুণদের ভোট বেশি পেয়েছেন তিনি। ৪৫ বছরের নিচের ভোটারদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা ছিল বিপুল। প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী কুয়োমোর চেয়ে ৪৩ পয়েন্টে এগিয়ে ছিলেন তিনি। অন্যদিকে ৪৫ বছরের উর্ধ্বে ভোটারদের মধ্যে কুয়োমো ১০ পয়েন্টে এগিয়ে ছিলেন।

ফিলিস্তিনে ইসরায়েল কর্তৃক নৃশংস হামলা, হত্যাযজ্ঞ এবং গাজার উপর হামলার প্রতিবাদ হয়েছে আমেরিকার সর্বত্র। এতে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং মামদানির ফিলিস্তিনপন্থি অবস্থান পুরো নির্বাচন জুড়েই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। তার মুসলিম পরিচয় ও ইসরায়েলবিরোধী অবস্থান নিয়ে বিরূপ প্রচারণা চালানো হলেও শেষ পর্যন্ত ভোটাররা তাকেই সমর্থন দেন। দেখা যাচ্ছে, মোট ইহুদি ভোটারদের ৩১ শতাংশ এবং তরুণ ইহুদিদের ৪৪ শতাংশ ভোট পান মামদানি। ইজরায়েলের ভূমিকা যে তরুণদের কাছেও গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না, এই নির্বাচনে সেটাও দেখা গেল। ফলে মুসলিম, আফ্রিকান, ইন্ডিয়ান ইত্যাদি পরিচয়ের চাইতেও বেশি গুরুত্ব পেয়েছে তার বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গি।

নিউইয়র্ক নাম শুনলেই চোখে ভাসে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি। আমেরিকার নিউইয়র্ক শহর, যার সরকারি নাম সিটি অফ নিউইয়র্ক একটি বন্দর শহর। আমেরিকার ৫০টি অঙ্গরাজ্যের অন্যতম নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের রাজধানীর নাম আলবানি। এই রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, হাডসন নদী ও ইস্ট নদীর মোহনায়, উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত নিউইয়র্ক শহর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মহানগরের একটি। শহরটি প্রশাসনিকভাবে পাঁচটি প্রশাসনিক অঞ্চল বা 'বারো'-তে (Borough) বিভক্ত, এগুলি হলো ম্যানহাটন, ব্রুকলিন, দ্য ব্রংক্স, কুইনস এবং স্ট্যাটেন আইল্যান্ড।

মূল নিউইয়র্ক শহরের আয়তন ৭৮৪ বর্গকিলোমিটার। প্রায় ৮৬ লক্ষ লোকের এই শহরের নাগরিকরা নিজেদেরকে নিউইয়র্কার বলতেও পছন্দ করে। আমেরিকার সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এই শহর। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশ বা অঞ্চলের মানুষ এখানে তাদের ভবিষ্যৎ গড়তে বসবাস করে। এই শহরের প্রায় ৩৬% অধিবাসীই আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করেনি। বহু ভাষা-সংস্কৃতি, নানা বর্ণ ও বহু ধর্মের মানুষ নিয়ে নিউইয়র্ক সত্যিই এক বিশ্ব নগরী। বলা হয় এখানে তেল আবিবের চেয়েও বেশি ইহুদি, ডাবলিনের চেয়েও বেশি আইরিশ, নেপোলির চেয়েও বেশি ইতালীয় আর সান হুয়ানের চেয়েও বেশি পুয়ের্তোরিকান মানুষ আছে। জরিপে দেখা গেছে ইংরেজি, স্প্যানিশ, ইতালিয়ান, চাইনিজসহ ৮০০-এর বেশি ভাষায় এই শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষ কথা বলে। ধর্ম পালনের দিক থেকে উদার এই নগরের মানুষদের মধ্যে লাতিনো খ্রিষ্টান ক্যাথলিক, কৃষ্ণাঙ্গ খ্রিষ্টান প্রোটেস্ট্যান্ট, ইহুদি ও মুসলিমরা সবচেয়ে বড় ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায়।

গত দুইশত বছরের ইতিহাসে নিউইয়র্ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে সম্পদশালী শহর। শহরটি একসময় নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের রাজধানী এমনকি সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও রাজধানী ছিল। এখনো নিউইয়র্ক শহর বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা কেন্দ্রগুলির একটি। বিশ্বব্যাপী নিউইয়র্ক শহরের রাজনীতি, গণমাধ্যম, বিনোদন ও পোশাকশৈলীর প্রভাব উল্লেখযোগ্য। জাতিসংঘের সদর দপ্তর এখানে একে তাই আন্তর্জাতিক কূটনীতির কেন্দ্র বলা হয়।

নিউইয়র্ক শহরের বেশিরভাগ মানুষ গণপরিবহন ব্যবহার করে। নিউইয়র্ক সিটি সাবওয়ে বিশ্বের বৃহত্তম দ্রুতগামী গণপরিবহন ব্যবস্থা। ৪৭২টি স্টেশন নিয়ে গঠিত এই পাতাল রেল হাডসন নদীর তলদেশ দিয়ে প্রায় আড়াই কিলোমিটার দীর্ঘ টানেলের মাধ্যমে নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যের সাথে সংযুক্ত। বাস এবং সাবওয়ে শ্রমজীবীদের জন্য যেন সাশ্রয়ী থাকে সেটাই ছিল মামদানির প্রচারনার প্রধান দিক।

মামদানির নির্বাচনী প্রচারনায় ছিল, যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহরের ভোটাররা চায় সরকার নাগরিকদের ব্যয় সাশ্রয়ের ওপর গুরুত্ব দিক। তার বক্তব্য ছিল, নিউইয়র্ক এমন একটি শহর যেখানে চারজনের মধ্যে একজন দারিদ্র্যের সাথে বসবাস করছে, এমন একটি শহর যেখানে প্রতিরাতে পাঁচ লাখ শিশু ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমায়। বিশাল বৈভবের আড়ালে বৈষম্যের বেদনাদায়ক চিত্র তুলে ধরেছেন তিনি।

বিবিসি'র সাথে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'এটি এমন একটি শহর যা নিজের সেসব বৈশিষ্ট্য হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছে, যেগুলো একসময় এটিকে বিশেষ করে তুলেছিল।' এর প্রেক্ষিতে নির্বাচন সামনে রেখে তার প্রস্তাবনাগুলো ছিলো—

নিউইয়র্ক শহরজুড়ে বিনামূল্যে নাগরিকদের জন্য বাস পরিষেবা। শহরের বাড়িভাড়া স্থির রাখা এবং ভাড়াটিয়াদের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি অবহেলা করা বাড়িওয়ালাদের জবাবদিহির ব্যবস্থা করা। খাদ্যসহ পণ্য সামগ্রীর সাশ্রয়ী মূল্যের ওপর জোর দিয়ে শহরের নিজস্ব মুদি দোকানের চেইন সৃষ্টি করা। ছয় সপ্তাহ থেকে পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের জন্য সারা শহরে বিনামূল্যে চাইল্ড কেয়ার প্রতিষ্ঠা। শ্রমজীবী ও সাধারণ নাগরিকদের জন্য সাশ্রয়ী বাসস্থানের সংখ্যা তিন গুণ বাড়ানো। এছাড়া শ্রমিকদের মজুরি ঘণ্টায় ৩০ ডলার করার কথা তিনি বলেছেন।

মামদানি মেয়র হিসেবে কতদুর সফল হবে বা তার প্রতিশ্রুতি কতদুর রাখতে পারবে সেটা নিয়ে বেশ সন্দেহ আছে। কিন্তু বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্রে নিউইয়র্কের নির্বাচনে যে ইশতেহার দিয়ে মামদানি নির্বাচন করেছেন ও নির্বাচিত হলেন তা খুবই গুরুত্বপুর্ন। ফ্রি বাস সার্ভিস, বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ, ধনীদের উপর ট্যাক্স বাড়ানো, শ্রমিকদের মর্যাদা দেওয়া ও মজুরি ন্যায্য করার যে দাবি মামদানি তুলে এনেছেন তা পুঁজিবাদের নীতির সাথে সাংঘর্ষিক শুধু নয় বিরোধীও। এসবই নয়া উদারনিতিবাদের বিরোধী ফলে ট্রাম্প বিক্ষুব্ধ ও আতঙ্কিত হয়ে মামদানিকে কমিউনিস্ট বলে গালিও দিয়েছে। কেন এই আতঙ্ক? কারণ নয়া উদারনিতিবাদের মুল কথা হলো, কোন কিছুই বিনামূল্যে পাওয়া যাবে না। রাষ্ট্র কিছুই ফ্রি দেবে না, পরিবহন, শিক্ষা-স্বাস্থ্যসেবা, সমস্ত পরিষেবা পরিচালিত হবে ব্যবসায়ীদের দ্বারা। তাঁরা বিনিয়োগ করবেন, ব্যবসা করবেন আর নাগরিকরা কিনে নেবেন। তাদের ঘোষিত লক্ষ্য—সামর্থ্য থাকলে কিনে ব্যবহার কর না হলে নাই। দেয়ার ইজ নো ফ্রি লাঞ্চ এটা খুব জনপ্রিয় কথা বা স্লোগান এখানে। টাকা আছে তো সব তোমার, টাকা নাই, কিছু নাই। টাকার মুল্যে বিবেচিত হবে অধিকারের সীমা।

রাষ্ট্র তাহলে কী করবে? ট্যাক্স নেবে আর প্রতিরক্ষার নামে সামরিক শক্তি বাড়াবে এবং প্রয়োজনে জনগণের উপর শক্তি প্রয়োগ করবে। একদল বুদ্ধিজীবী প্রচার করতে থাকবেন, প্রত্যেকের সামর্থ্য থাকা উচিত, ভালো বাসস্থান থাকা উচিত, পুষ্টিকর খাবার খাওয়া উচিত তা নাহলে জীবন বিকশিত হবে না। এইসব কথা তো শুনতে ভালো কিন্তু স্বল্প আয়ের মানুষের এতো টাকা কই যে জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও পরিষেবা কিনবে? এই প্রশ্নে তাঁরা নিরবতা অবলম্বন করবেন। পুঁজিপতিরা ব্যবসা করবে, ব্যবসা বাড়াবে এবং এটাকেই রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষমতা বলে প্রচার করতে থাকবে। বিরাট বিরাট হাউজিং প্রকল্প, বিশাল এপার্টমেন্টে অসংখ্য ফ্লাট তৈরি করছে পুঁজিপতিরা কিন্তু কিনবে যারা সেই নাগরিকদের এত টাকা কোথায়? ফলে এগিয়ে এলো ব্যাংক। তাঁরা স্বপ্ন দেখায়, চাহিদা তৈরি করে। তোমার কী একটা বাড়ি, নিজের গাড়ি থাকবে না? সাধারণ মানুষ বলে সেটা তো ঠিক কিন্তু নুন আনতে পান্তা ফুরায় এমন অবস্থা আমাদের। বাড়ি গাড়ি অনেক দূরের স্বপ্ন। ব্যাংক বলে সেই দূরের স্বপ্নকে কাছে আনতেই তো আমরা তোমাদের পাশে। লোন নাও, বাড়ি কেনো, গাড়ি কেনো। এরপর বাড়ি হয় গাড়ি হয়, জীবন শেষ হয়ে যায় কিন্তু ঋণের কিস্তি শোধ হয় না। আবার ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত বাড়ির মালিকানাও পায় না। কাগজ থাকে ব্যাংকের কাছে। এখানে আবার আরেক সমস্যা। ঋণ গ্রহীতা মরে গেলে কী হবে? ব্যাংকের কাছে কাগজের কী মুল্য যদি কিস্তির টাকা না আসে। এই শোধ দিতে না পারা ঋণের কারণেই ২০০৭-৮ সালে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছিল। বাড়ি আছে, ব্যাংকে বাড়ির দলিল আছে শুধু ঋণ শোধ দেয়ার টাকা নাই মানুষের হাতে। ফলে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল অনেক ব্যাংক। এক মহামন্দার কবলে পড়েছিল আমেরিকা।

এই মন্দা, কোভিড এবং রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের মুনাফা পুঁজিবাদীরা পেলেও এর ফল ভোগ করতে হয়েছে শ্রমজীবীদের। বেকারত্ব বেড়েছে, কমেছে আয়, বেড়েছে জীবনযাত্রার ব্যয়। দাবি উঠেছে রাষ্ট্র দরিদ্রদেরকে সহায়তা করুক। কিন্তু পুঁজিবাদী দর্শন বলে শ্রমিকরা কাজ করে না, অদক্ষ, উৎপাদনশীলতা কম, টাকা উড়ায়, যা পায় তাই খেয়ে শেষ করে ফেলে, সঞ্চয় করে না তাই গরিব। অর্থাৎ সে গরিব তার নিজের দোষে। এই গরিবদেরকে খাদ্য-চিকিৎসা, বাসস্থানে সহায়তা দিলে তাঁরা আরও অলস হয়ে পড়বে। ধনীরা কারখানা করে, ব্যবসা করে, ব্যাংকের মালিক তারাই তো দেশকে চালায়। এদের উপর ট্যাক্স বসালে তাঁরা সমস্যায় পড়বে আর অর্থনীতি দুর্বল হবে। ফলে সহায়তা করতে হলে ধনী এবং শিল্পপতিদেরকে সহায়তা কর, সুবিধা দাও। পুঁজিবাদের এবং নয়া উদারনিতিবাদের এই নীতিতে আমেরিকার অর্থনীতি চলে। ফলে ধনী আরও ধনী হয় শ্রমিক এবং স্বল্প আয়ের মানুষ আরও কষ্টে পড়ে।

মামদানি উদারনিতির এই দর্শনে একটা বড়সড় ধাক্কা দিয়েছেন। যদিও মামদানির কোন কথাই নতুন না। আমেরিকার সমাজতন্ত্রীরা দীর্ঘদিন ধরেই এই কথা বলছে। ২০০৮ সালের মন্দা, ২০২০ সালের করোনা এবং ২০২২ সালের ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের ফলে কারা লাভবান হলো আর কারা সর্বস্বান্ত হলো এটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। এসব কথার সত্যিকারের তাতপর্য কি, তা নিউইয়র্কবাসী তাদের জীবন দিয়ে বুঝতে পেরেছে। ফলে মামদানি যখন নির্বাচনে শ্রমজীবী, নিম্ন আয়ের মানুষের দাবি এবং তা পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তখন তাঁর কথা নিউইয়র্কবাসী গ্রহণ করেছে। এর সাথে আর একটি বিষয় কম গুরুত্বপুর্ন নয়। মামদানি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিচয়কে সম্মান দিয়েছেন। সকল ধর্ম-বর্ণ, লিঙ্গ, পেশার মানুষই নাগরিক মর্যাদা ও অধিকার লাভের অধিকার রাখে। এই নির্বাচনে সমাজতন্ত্রের কথা যেভাবে উচ্চারিত হয়েছে তা আমেরিকার শাসকগোষ্ঠী এত সহজে ভুলে যাবে না। ফলে পদে পদে বিরোধিতা মোকাবিলা করেই মামদানিকে পথ চলতে হবে। এই বিজয়ের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে নাগরিকদের আকাঙ্ক্ষা। পুঁজিবাদী শোষণ শুধু বিক্ষোভের জন্ম দিচ্ছে না জন্ম দিচ্ছে অধিকার সচেতনতার। তাঁর বহিঃপ্রকাশ ঘটে মাঝে মাঝেই। মামদানির নির্বাচিত হওয়ার পিছনে এটাও একটা কারণ। যদিও আমরা জানি সকল মানুষের প্রকৃত মর্যাদা ও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানাভিত্তিক মুনাফাকেন্দ্রিক শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই প্রধান প্রতিবন্ধক। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কাঠামোর ভেতর থেকে মামদানি কতদুর তার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে পারবেন সেটাই এখন বিশ্ববাসীর দেখার বিষয়।

মানবিক বোধ জাগাতে লালন চর্চার আহ্বান জানিয়ে

লালন ফকিরের প্রয়াণ দিবস পালিত

রাষ্ট্রীয় মদতে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী মব সন্ত্রাস চালাচ্ছে

চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

লালনের দর্শন চিন্তায় মিলনের চেতনায় সকলকে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেন, লালন ফকির ছিলেন একজন অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন লোকদার্শনিক ও বাউল সাধক। হাজার বছরের প্রবাহমান বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তিনি ছিলেন এক অসাধারণ প্রতিভাবান ও সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্ব।

লালন ফকিরের কাব্যবোধ ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং উপমা-অলঙ্কার, রূপক ও শ্লেষ ব্যবহারে তিনি ছিলেন অনন্য দক্ষ। পরিমিতিবোধে তিনি ছিলেন একজন উঁচুমানের সাহিত্যিক। তাঁর সংগীতে লোকজ প্রতীকের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। সহজ কথাকে সহজভাবে উপস্থাপনের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। ধর্মতত্ত্বে তাঁর জ্ঞান ছিল অসাধারণ। আধুনিক যুগের জীবনজিজ্ঞাসা ও সমাজ-ভাবনার সমস্যাগুলোর সাথেও তাঁর গভীর পরিচয় ছিল। তিনি ছিলেন একজন মননশীল সাধক। তাঁর গান, দর্শন ও মানবতাবাদী চিন্তাধারা আজও মানুষকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে চলেছে।

লালন ফকির কালজয়ী অসংখ্য গানের স্রষ্টা, যার মাধ্যমে তিনি ধর্ম, সমাজ এবং মানুষের আত্মিক মুক্তির কথা বলেছেন। একইসাথে, তিনি সমাজের বাস্তব অসঙ্গতি ও ধর্মীয় কুসংস্কারগুলো তুলে ধরে মানুষের চিন্তাজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। তিনি জাতপাতের বিভেদের তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং নারী-পুরুষের সমতার বিষয়ে ছিলেন সোচ্চার। তাঁর গুরু সিরাজ সাঁই-এর কাছ থেকে দীক্ষিত হয়ে তিনি সারাজীবন বাউল দর্শনের সাধনা করেছেন। তাঁর সাধন ক্ষেত্র ছিল কুষ্টিয়া। সাবেক কুষ্টিয়া মহাকুমা নদীয়া জেলার একটি অংশ ছিল। নদীয়া জেলাকে একসময় বাংলার সাংস্কৃতিক রাজধানী বলা হতো। কাঙ্গাল হরিনাথ ও মীর মোশাররফ ছিলেন লালনের বন্ধু। কাঙ্গাল হরিনাথ গ্রাম বার্তা পত্রিকা প্রকাশ করতেন। কৃষক প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা তাতে স্থান পেত।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও লালন সমাজের সাধারণ মানুষের গভীর ভাব-সম্পদকে ধারণ করতে পেরেছিলেন। নিজ সাধনাবলেই তিনি হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ ধর্মের শাস্ত্র সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তাঁর দর্শন ছিল জাতপাত, ধর্মীয় গোঁড়ামি, সমাজের কুসংস্কার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে। তাঁর রচনায় এর প্রতিফলন দেখা যায়, যেমন—'লালন কয় জাতের কি রূপ দেখলাম না এ নজরে'।

রাজা রামমোহন রায় বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইউরোপীয় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে আলোকিত হয়েছিলেন, অন্যদিকে লালন আলোকিত হয়েছিলেন এ দেশের মাটি ও মানুষের অন্তঃস্রোত দ্বারা। তাঁর দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল মানুষ ও মানবতা। তিনি লিখেছেন—'মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি'। তিনি ছিলেন বাউল দর্শনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব; ধর্ম, বর্ণ ও লিঙ্গভেদের ঊর্ধ্বে উঠে একটি সর্বজনীন মানবধর্মের প্রচার করেছিলেন। মূলত, অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে অনন্য করে তুলেছে।

লালনের সৃষ্টি কেবল বাংলায়ই নয়, আজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লালনের গান সংগ্রহ করেছিলেন, প্রচার করেছেন এবং তাঁর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কাঙাল হরিনাথ ও মীর মোশাররফ হোসেনের মতো ব্যক্তিত্বদের উপরও লালনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

কমরেড ফিরোজ বলেন, লালনের সময়কালেও মুসলমানরা বাউলদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত ছিলেন। সুন্নি মুসলমানদের একটা অংশ বাউল দমনের ফতোয়া জারি করেছিলেন। এর ফলে অনেক সহিংস ঘটনাও ঘটে। গোড়া আমেলরাও তাই করেছিলেন। মাঝে মাঝে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে বাহাসও হতো। এই কারণে আত্মপক্ষ সমর্থনে লালনকে গভীরভাবে ধর্মের শিক্ষা জানতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন শিলাইদহে জমিদারির কাজে আসাযাওয়া করতেন তখনও লালন বেঁচে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে উদ্যোগী হয়ে লালনের গান সংগ্রহ করেছিলেন এবং সেগুলো প্রবাসী পত্রিকায় ছাপিয়েছিলেন। লালনের যে প্রতিকৃতি আমরা দেখি সেটি এঁকেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাই জ্যোতিরীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

কমরেড ফিরোজ আরও বলেন, লালনের সৃষ্টিসম্ভার আজ বিশ্ব সাহিত্যের অংশ হিসাবে সমাদৃত। ২০০৫ সালে ইউনেস্কো বাংলাদেশের বাউল গানকে মানবতার মৌখিক ও অস্পষ্ট ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, যার মধ্যে লালনের অবদান অপরিসীম। 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি—বাউল দর্শনের আত্মার মুক্তির আকুতি যেমন প্রকাশ পায় তেমনি 'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে'—এটা হলো জাতিভেদের অসারতার প্রকাশ।

কমরেড ফিরোজ বর্তমান প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী সরকারের পতন ঘটলেও ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার মূলোৎপাটন হয়নি বরং তা ভিন্ন রূপে দেশে বিরাজ করছে। ফলশ্রুতিতে, গত দেড় বছরে রাষ্ট্রের পরোক্ষ মদদে উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান ঘটেছে, যা সারাদেশে একপ্রকার মব সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে চলছে। যার ফলে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্থান—যেমন মাজার-আখড়া, মন্দির, পিরের দরগায় হামলা ও ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ হচ্ছে, যাত্রাগান-পালাগান, লালনসহ বাউলদের আখড়া, চর্চাকেন্দ্রে ভাঙচুর ও সংগীতের সরঞ্জাম ধ্বংস করা হচ্ছে, নাটক প্রদর্শন ও বই মেলা স্থগিত হয়েছে, চারুকলার 'অবিনাশী বাংলা' ভাস্কর্য ভাংচুর, জেলায় জেলায় আয়োজিত লোকজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বন্ধ করেছে, মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ভাস্কর্যে হামলা ভাঙচুর চালিয়েছে, বাংলার বহুধারায় বিকশিত সংস্কৃতির ওপর আক্রমণ চলছে, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে মব লিঞ্চিং ও হত্যাকাণ্ড ঘটছে, নুরাল পাগলার লাশ কবর থেকে তুলে পোড়ানোর মতো জঘন্য ঘটনা ঘটেছে; নারীকে অবমাননা-অপমান, নির্যাতন করা, ফুটবল খেলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান করছে, খাগড়াছড়িতে কিশোরী ধর্ষণের বিচারের দাবিতে আন্দোলনরতদের ওপর হামলা, বাড়িঘর, দোকানপাটে অগ্নিসংযোগের মধ্যদিয়ে ক্ষতিসাধন ও তিন পাহাড়ি ব্যক্তিকে হত্যা—এগুলোর মধ্যদিয়ে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটিয়ে চলছে।

কমরেড ফিরোজ বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক ১৯৭২-এর সংবিধানের মূলনীতি—সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ—পরিত্যাগ করে রাজনৈতিক দলসমূহের মতামতকে উপেক্ষা করে জুলাই সনদকে এক তামাশার দলিল প্রণয়ন করে জাতিকে দীর্ঘসময় ধরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বাহিরে রাখার গোপন ইচ্ছা পূরণ করছে এবং দেশে বন্দর ইজারা দেওয়া, করিডোর প্রদান, বিদেশিদের সমরাস্ত্র কারখানা নির্মাণের অনুমতি, সাম্রাজবাদের সাথে গোপন বাণিজ্য চুক্তিসহ নানা ষড়যন্ত্রের পথে হাঁটছে।

জাতির এই সংকটময় পরিস্থিতিতে কমরেড ফিরোজ লালনের দর্শনকে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হিসেবে অভিহিত করে বলেন, বিভেদ, বিদ্বেষ ও ঘৃণার রাজনীতির বিরুদ্ধে মিলনের রাজনীতি গড়ে তোলার এখনই সময়। লালনের চিন্তা-দর্শন এই পথেই আমাদের পথনির্দেশ করতে পারে। তিনি ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে বলেন, পুঁজিবাদী শোষণ, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও মৌলবাদী আস্ফালনের বিরুদ্ধে জনগণকে রাজপথে সক্রিয় ও সংগঠিত হতে হবে। অধঃপতিত বুর্জোয়া অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে সুস্থ, প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে জোরদার করতে হবে।

ফকির লালন-এর ১৩৬তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে ১৭ অক্টোবর '২৫ কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের আয়োজনে আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। 'মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি'—লালনের এই অমোঘ বাণীকে মূল প্রতিপাদ্য করে সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি নিখিল দাসের সভাপতিত্বে আলোচনা করেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সহসভাপতি শাহজাহান কবীর, কবি কামরুজ্জামান ভূঁইয়া এবং সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদস্যসচিব অদিতি ইসলাম। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন।

প্রাথমিকে শারীরিক শিক্ষা ও সংগীত শিক্ষকের পদ পুর্নবহালের দাবি

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ও চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

প্রাথমিকে সংগীত ও শারীরচর্চা শিক্ষক পদ পুর্বহালের দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ও চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে ১২ নভেম্বর '২৫ শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনে সমাবেশ শেষে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সভাপতি নিখিল দাসের সভাপতিত্বে সমাবেশ বক্তব্য দেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মুক্তা বাড়ৈ, চারণ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, সহসভাপতি কামরুজ্জামান ভুঁইয়া; ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সুহাইল আহমেদ শুভ ও সমাবেশ পরিচালনা করেন ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, সংস্কৃতিকর্মীদের দীর্ঘদিনের দাবির ফলে শিশুদের শারীরিক সক্ষমতা গঠন ও সুষম মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষায়তনে সংগীত ও শরীর চর্চা শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল। বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় আসক্তি, মাদক ব্যবহার, কিশোর গ্যাং, জঙ্গিবাদী প্রবণতা থেকে শিশু

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের আজীবন আয়ের সমান ক্ষতিপূরণ দিতে হবে

বাম গণতান্ত্রিক জোট

১৪ অক্টোবর '২৫ মিরপুর শিয়ালবাড়ি এলাকায় কসমিক ফার্মা নামের একটি কেমিক্যাল গোডাউনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যাওয়া ভবন এবং আগুন ছড়িয়ে পড়া এলাকা ১৫ অক্টোবর পরিদর্শন করেন বাম গণতান্ত্রিক জোটের নেতৃবৃন্দ।

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থল, ভুক্তভোগী শ্রমজীবী মানুষ ও বিভিন্ন স্তরের জনগণের সাথে কথা বলেন এবং আগুন নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তাদের কাছ থেকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, কেমিক্যাল গোডাউনের আগুন ও গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে পাশে অবস্থিত গার্মেন্টস কারখানায়। দাহ্য পদার্থ হওয়ায় আগুন ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। আগুনে সৃষ্ট বিষাক্ত ধোঁয়া পার্শ্ববর্তী ভবনে ছড়িয়ে পড়লে দম বন্ধ হয়ে ১৬ জন মানুষ মৃত্যুবরণ করেন এবং অনেকে আহত হন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ঘনবসতিপূর্ণ আবাসিক এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ কেমিক্যালের গোডাউন ও তৈরি পোশাক কারখানা কীভাবে গড়ে ওঠতে পারে তা দেশের মানুষের বোধগম্য নয়। যেখানে–কারখানা ও দাহ্যপদার্থ ব্যবসার জন্য স্থানীয় সরকারের কাছ থেকে ট্রেড লাইসেন্স, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর থেকে লাইসেন্স, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র, নিরাপত্তা বিষয়ক ছাড়পত্রসহ ১৭টি প্রতিষ্ঠানের অনুমতি ছাড়া কোন শিল্পকারখানা স্থাপন করা যায় না। আর ব্যবসা করতেও অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। ফলে এই অগ্নিকাণ্ডের দুর্ঘটনায় প্রমাণ হয় এই সব বিধিবিধান না মেনে অবৈধভাবে এখানে এইসব ঝুঁকিপূর্ণ কার্যক্রম চলছিল। তাই এর জন্য সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার দায়িত্ব অবহেলা কিংবা দুর্নীতির মাধ্যমে কার্যক্রম চালানোর অনুমতি প্রদানই দায়ী। দায়িত্বহীনতা, দুর্নীতি সংশ্লিষ্টতা ও কাজের গাফিলতি আর মালিকের মুনাফার লালসাই এই মৃত্যুর জন্য দায়ী। অনিয়মের জন্য নাগরিকরা আইনের সুরক্ষা পায় না।

নেতৃবৃন্দ এই অগ্নিকাণ্ডে মানুষ হত্যা-আহত হওয়া ও অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ অবৈধ ব্যবসা করা মালিক ও সংশ্লিষ্ট তদারকি কর্তৃপক্ষের দায় যথ যথ তদন্ত, দায়ীদের বিচার ও শাস্তি দাবি করেন এবং একই সাথে নিহতদের আজীবন আয়ের সমান ক্ষতিপূরণ এবং আহতদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের দাবি জানান।

নেতৃবৃন্দ বলেন, অপরাধ বা অন্যায়ের শাস্তি হলে যেমন আপরাধ প্রবণতা কমতে থাকে তেমনি অপরাধ করে পার পেয়ে গেলে প্রবণতা বাড়তে থাকে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশে এটা কোনও নতুন দুর্ঘটনা নয়। এর আগে সারাকা গার্মেন্টস, স্পেকট্রাম গার্মেন্টস, তাজরীন ফ্যাশন কারখানা, নীমতলি ট্র্যাজেডি, চকবাজার ট্র্যাজেডি, টাম্পাকো

ফয়েলস, হাশেম ফুড এন্ড বেভারেজ কারখানা, বনানীর এফ আর টাওয়ার, বেইলীরোড, বিএম ডিপোর মতো পূর্বের ট্র্যাজেডির অভিজ্ঞতা থেকেও সরকার, প্রশাসন ও মালিকরা কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেনি।

নেতৃবৃন্দ বলেন, কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের মৃত্যু হলে আজীবন আয়ের সমান ক্ষতিপূরণ দিতে হবে; কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা প্রদান করতে ব্যর্থ হলে শাস্তি দিতে হবে; দুর্ঘটনায় আহত, পঙ্গু শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ, আজীবন চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে; কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা বিমা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

পরিদর্শন দলে নেতৃত্ব দেন বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক ও বাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ ক্বাফি রতন, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল কবির জাহিদ, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, বাসদ (মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় সদস্য রাশেদ শাহরিয়ার, সমাজতান্ত্রিক পার্টির আব্দুল আলী, সিপিবির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ডাঃ সাজেদুল হক রুবেল, বাসদ ঢাকা মহানরনগর নেতা নাসির উদ্দিন প্রিন্স ও কমিউনিস্ট লীগের ঢাকা মহানগর নেতা ইকবাল কবিরসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বরিশালে অপসো স্যালাইনে ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে শ্রমিকরা রাজপথে

পহেলা নভেম্বর ২০২৫ থেকে বরিশাল শহরের বগুড়া রোডে অপসো স্যালাইন ফার্মার গেটের সামনের দৃশ্য নগরবাসীকে হতবাক করেদিয়েছে। হাতে খাবার থালা নিয়ে স্কুলের ছোট ছোট শিশুরা বসে আছে। তাদের স্লোগান, 'আমার পেটে ভাত নাই, আমার বাবার চাকরি চাই!' সাথে আছে মায়েরা আর চাকরিচ্যুত বাবারা তো আছেই। এই চরম অমানবিক পরিস্থিতির পিছনে অজুহাত কারখানার শ্রমিকদের সংঘব্ধ হওয়া, তথা ট্রেড ইউনিয়ন গঠন। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করাকে হুমকি বিবেচনায় একে গুড়িয়ে দেওয়ার মালিকের মানসিকতা। ঘটনার শুরু ২৯ অক্টোবর, যখন কারখানা কর্তৃপক্ষ হঠাৎ করেই ৫৭০ জন শ্রমিককে ছাঁটাইয়ের ঘোষণা দেয়।

২৯ অক্টোবর, অপসোনিন গ্রুপভুক্ত প্রায় ৪০ বছর ধরে চলতে থাকা এই ওষুধ কারখানাটি হঠাৎ একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে কারখানার 'স্টেরিপ্যাক ডিপার্টমেন্ট' বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা দেয়। কলমের এক খোঁচায় কাজ হারিয়ে বেকার হয়ে পড়ে পাঁচ শতাধিক শ্রমিক। আইনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, কারণ হিসাবে মৌখিকভাবে—লাভ না হওয়ার কথা বললেও প্রকৃত সত্য আড়ালে রেখেছে। শ্রমিক ছাঁটাইয়ের এই সিদ্ধান্তের মাত্র মাস খানিক আগে, এই কারখানার শ্রমিকরা একটি শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করেছে। ইউনিয়ন গঠনের পর থেকেই মালিকপক্ষ শ্রমিকদের উপর চাপ ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করতে থাকে। বস্তুত, কারখানা কর্তৃপক্ষ যেন ইউনিয়নের কর্মকর্তা আর সদস্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে মাঠে নেমেছে। ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার এক মাসের মধ্যে ইউনিয়নের কার্যকরী পরিষদের ৯ জন কর্মকর্তাসহ শতাধিক সদস্যকে ছাঁটাইয়ের তালিকা প্রস্তুত করেছিল। সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে সক্রিয়তাকে দমন করা এই ছাঁটাইয়ের মূল উদ্দেশ্য। কারখানা প্রতিষ্ঠার পর এ ধরনের ব্যাপক ছাঁটাইয়ের কোনো নজির নেই। বাংলাদেশ শ্রম আইনের ১৯৫ (খ) ধারা অনুযায়ী, এটি একটি অসৎ শ্রম আচরণের (Anti Trade Union Descrimination) আওতায় পড়ে।

এই সংকটের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো কারখানায় স্থায়ী ও অস্থায়ী শ্রমিকের বিষয়টি। ২০২৪-এর ছাত্র-শ্রমিক, জনতার গণ অভ্যুত্থানের আগ পর্যন্ত মালিকের নিকটাত্মীয় জনৈক মন্ত্রীর প্রভাবে কোম্পানিটি দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে কর্মরত অধিকাংশ শ্রমিককে অস্থায়ী রেখে কাজ চালিয়েছে। অভ্যুত্থানের পর সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের নেতৃত্বে ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলে অপসোনিন গ্রুপের তিনটি কারখানায় কর্তৃপক্ষ প্রায় দেড় হাজার শ্রমিকের চাকরি স্থায়ী করতে বাধ্য হয়। এবারের ছাঁটাইয়ের শিকার অনেক শ্রমিকই হচ্ছেন নতুন স্থায়ী কর্মী। মালিকপক্ষ ২৯ অক্টোবর স্থায়ী শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ঘোষণা দিয়েই ১ নভেম্বর আবার নতুন করে অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিও দিয়েছিল যা প্রমাণ করে যে, মালিকপক্ষ স্থায়ী শ্রমিকদের ছাঁটাই করে আবার অস্থায়ী রূপে ফেরত যেতে চান। তীব্র আন্দোলনের মুখে কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তিটি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে ১ নভেম্বর থেকে শ্রমিক তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে রাস্তায় অবস্থান নিয়েছেন।

ছাঁটাইয়ের খবর প্রকাশিত হওয়ার পরই সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট সংশ্লিষ্ট শ্রমিক ইউনিয়নের পাশে দাঁড়িয়েছে, কারখানা গেটে অবস্থান নিয়ে ছাঁটাইয়ের এই সিদ্ধান্তকে অবৈধ, অমানবিক ও শ্রমিকবিরোধী আখ্যা দিয়ে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন। এর প্রতিবাদে ৩০ অক্টোবর বরিশাল শহরে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়।

৩১ অক্টোবর অশ্বিনী কুমার হল চত্বরে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবীব বুলবুল, বাসদ বরিশাল জেলার সমন্বয়ক ডা. মনীষা চক্রবর্তী, জেলা শ্রমিক ফ্রন্টের নেতা শহিদুল হাওলাদার, বেল্লাল গাজী, শহিদুল ইসলাম, রমজান আকন, ছাত্র ফ্রন্টের নেতা সুজন আহমেদসহ বিভিন্ন ফার্মাসিউটিক্যাল ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ।

পরবর্তী কর্মসূচি ভুখা মিছিল, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে দাবিসম্বলিত স্মারকলিপি প্রদানের পাশাপাশি কারখানা এলাকায় অবস্থান নিয়ে দাবি আদায়ে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছেন। মালিকপক্ষ তাদের শ্রমিকদের সাথে বৈঠক করেও প্রতারণামূলক আচরণ করেছে।

এই আন্দোলনে অপসো স্যালাইন লি. শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজি নং বরিশাল ৭১)-এর সাথে আরও বেশ কয়েকটি বেসিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন, বাম গণতান্ত্রিক জোট, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল, এনসিপিসহ বরিশালের বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষও এই আন্দোলনের যৌক্তিক দাবির সাথে একাত্মতা প্রকাশ এবং দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত শ্রমিকদের সাথে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন।

শারীরিক ও সংগীত শিক্ষকের পদ পুর্নবহালের দাবি

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

কিশোরদের রক্ষা করতে এবং দেহ-মনে বিকশিত হতে সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চা ও খেলাধূলার বিকল্প নেই। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সরকার কয়েকটি কূপমণ্ডূক ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর আপত্তির মুখে আত্মসমর্পণ করেছে। এটি সরকারের আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত ও শিশু বিকাশে অন্তরায়। এই ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠী শারীরিক ও মানুষিকভাবে একটি পঙ্গু প্রজন্ম তৈরি করতে চায়। এই গোষ্ঠীর দাবির প্রেক্ষিতে গত বছরে অক্টোবর মাসে পাঠ্যপুস্তক সংশোধন ও পরিমার্জন কমিটি বাতিল করেছে সরকার। পাঠ্যপুস্তক থেকে 'আদিবাসী' গ্রাফিতি সরিয়ে দিয়েছে। ৫ আগস্টের পর থেকে এই সাম্প্রদায়িক অপশক্তি 'মব' সন্ত্রাস তৈরি করে সারাদেশে মাজার-মন্দির আক্রমণ, ভাংচুর, ভিন্ন মতাবলম্বীদের হত্যা, কবর থেকে লাশ তুলে পুড়িয়ে ফেলা, মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য ভাংচুর, চারুকলায় হামলার মতো ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে। বিগত ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সরকারের আমলেও হেফাজত ইসলামের দাবির মুখে পাঠ্যপুস্তক থেকে দেশপ্রেম ও অসাম্প্রদায়িক বার্তাবাহী লেখা বাদ দিয়েছিল, শুধুমাত্র 'হিন্দু' ও 'মুক্ত চিন্তার' হওয়ার কারণে।

একদিকে শ্রমজীবী মানুষ তাদের রুটি-রুজির জন্য রাস্তায় নামলে লাঠি পেটা করে-গুলি করে হত্যা করে, শিক্ষকদের মিছিলে জলকামান ব্যবহার করে, অন্যদিকে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠীকে পৃষ্ঠপোষকতা করে সরকার। প্রাথমিকে সংগীত ও শারীরিক শিক্ষকের পদ বাতিল করার সিদ্ধান্ত তার ধারাবাহিকতা মাত্র। সরকারের এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে প্রাথমিকে শারীরিক ও সংগীতের শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে শিশু কিশোরদের মানবিক বিকাশের রাস্তা খুলে দেওয়ার দাবি জানান নেতৃবৃন্দ। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

সোভিয়েতের পতন : রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতা ও ঐতিহাসিক মিথ্যাচার

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

'...আপনি মানুষকে এর জন্য অজুহাত খুঁজতে বাধ্য করতে পারবেন না, কারণ স্ট্যালিনের সমষ্টিকরণের ভয়ানক বিপর্যয়ের পরেও ৫-৬ বছর পরে (এবং এটি ঠিক পেরেস্ত্রোইকার সমান সময়) 'জীবন আরও উন্নত হয়ে ওঠে, জীবন আরও আনন্দময় হয়ে ওঠে' (স্টালিন)। আমার নিজেরই এটা মনে আছে। আমি এটি নিজের চোখে দেখেছি। এবং লোকেরা জিজ্ঞাসা করে–১০০ গুণ বেশি সম্পদের সাথে কেন এটি এখন ঘটেনি ...এটা বলা ঠিক যে বিশৃঙ্খলা ছাড়া পূর্ববর্তী ব্যবস্থা ধ্বংস করা অসম্ভব। কিন্তু মানুষ ৭০ বছরের অপরাধমূলক নীতির জন্য অর্থ প্রদান করতে চায় না। আর তারা কখনোই বুঝতে পারবে না কেন, একবিংশ শতাব্দীর শেষে একটি সভ্য দেশ হতে হলে, আমাদের কেন ক্ষুধা-পতন, অশ্লীলতা, অপরাধ এবং এধরনের বিষয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হবে।'

সমষ্টিকরণ সম্পর্কে চেরনিয়াভ ভুল ছিলেন। তিনি বলেন যে, সমষ্টিকরণ ছিল 'একটি বিপর্যয়'। তবুও পরবর্তী বাক্যে তিনি স্বীকার করেন যে, এটি কোনওভাবে জীবনযাত্রার উচ্চতর মানের দিকে পরিচালিত করেছিল। তাহলে 'বিপর্যয়' কোথায়? অধ্যাপক টাগার দেখিয়েছেন যে, সমষ্টিকরণ অপরিহার্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে, সমষ্টিকরণ শতাব্দী ধরে রাশিয়াকে ধ্বংস করে দেওয়া দুর্ভিক্ষের ধারাবাহিকতার অবসান ঘটিয়েছে।

দয়া করে লক্ষ্য করুন যে, চেরনিয়াভ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে 'ক্ষুধা-পতন, অশ্লীলতা, অপরাধ' ইত্যাদি একশ বছর স্থায়ী হবে! গর্বাচেভ, ইয়াকোভলেভ এবং তাদের অনুসারীরা সচেতনভাবে তাদের সন্তান, তাদের নাতি-নাতনি এবং তাদের প্রপৌত্র-প্রপৌত্রদের 'ক্ষুধা-পতন, অশ্লীলতা এবং অপরাধ' এর জন্য নিন্দা করেছিলেন!

গর্বাচেভ এবং ইয়াকোভলেভ জানতেন যে তাদের তথাকথিত 'সংস্কার' এর অর্থ হলো সোভিয়েত ইউনিয়নকে পুঁজিবাদে পরিণত করা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্মিলিতভাবে সৃষ্ট সম্পদকে কার্যত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হাতে তুলে দেওয়া। তারা জানত যে এটি সোভিয়েত শ্রমিক শ্রেণির জন্য ভয়াবহ কষ্টের কারণ হবে। তবুও তারা তা করেছিল!

কিন্তু তারা কেন তা করেছিল? তারা স্ট্যালিনের আমল সম্পর্কে ক্রুশ্চেভের মিথ্যাচার বিশ্বাস করেছিল। আমরা জানি তারা এগুলি বিশ্বাস করেছিল কারণ তারা বলেছিল যে, তারা এগুলি বিশ্বাস করে এবং তারা সেই বিশ্বাসের উপর কাজ করে। স্ট্যালিন সম্পর্কে মিথ্যাগুলি শোষণমূলক পুঁজিবাদে ফিরে যাওয়ার এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনকে প্রত্যাখ্যান করার ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। ইয়াকোভলেভের ভাষায়, 'জার্মান নাৎসিবাদ, ইতালীয় ফ্যাসিবাদ, স্প্যানিশ ফ্রাঙ্কোবাদ বা পোল-পোটিজমের সাথে একই ধরণের ঘটনা' হিসাবে।

যারা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনকে ফ্যাসিবাদের চেয়ে 'একটি অপরাধমূলক উদ্যোগ' বলে মনে করতেন, তারা কীভাবে লেনিন এবং স্ট্যালিনের দলের নেতৃত্বে পরিণত হলেন? এই প্রশ্নের উত্তরের একটি অংশ হলো তারা ক্রুশ্চেভকে বিশ্বাস করতেন। ক্রুশ্চেভ ছিলেন পার্টির নেতা। তিনি ১৯৩৮ সাল থেকে পলিটব্যুরোতে ছিলেন। সম্ভবত–এবং আমরা এটি নিশ্চিতভাবে জানি না কারণ কেউ কখনও এটি নিয়ে গবেষণা করেনি–ক্রুশ্চেভ পার্টির প্রথম সচিবদের সাথে জোট গড়ে তোলার ঝামেলা করেছিলেন, যারা প্রকৃতপক্ষে তাদের নিজস্ব এলাকা থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিচালনা করেছিলেন এবং যারা পার্টির একক সবচেয়ে শক্তিশালী ব্লক ছিলেন।

কিন্তু তাহলে, কেন এই লোকেরা ক্রুশ্চেভের মিথ্যাচার বিশ্বাস করেছিল? ব্যক্তিগত ক্যারিয়ারবাদ অবশ্যই একটি ভূমিকা পালন করেছিল। এছাড়াও তারা পার্টি নেতৃত্বকে বিশ্বাস করতে এবং নেতৃত্বের নির্ধারিত নীতি অনুসরণ করতে অভ্যস্ত ছিল। তারা স্ট্যালিনের অধীনে এটি করেছিল এবং ক্রুশ্চেভের অধীনেও তা চালিয়ে গিয়েছিল।

তারা অবশ্যই জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ক্রুশ্চেভের রাজনৈতিক লাইনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল, এমন নীতি যা স্ট্যালিনের সমর্থিত নীতি থেকে তীব্রভাবে দূরে সরে গিয়েছিল। সম্ভবত সবচেয়ে বেশি পরিচিত ছিল : সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একমাত্র পথ হিসেবে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সহিংস বিপ্লব পরিত্যাগ করা; পুঁজিবাদী দেশগুলির সাথে 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের' নীতি, যা 'ইউরোকমিউনিজম' নামে পরিচিত হয়েছিল–বিপ্লবী পরিবর্তনের অপরিহার্য এজেন্ট হিসাবে শ্রমিক শ্রেণিকে প্রত্যাখ্যান এবং নির্বাচনী রাজনীতিকে আলিঙ্গন করা। এর ফলে শ্রমিক শ্রেণির সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য এই অন্যান্য শ্রেণিগুলিকে জয় করার পরিবর্তে অন্যান্য শ্রেণির সাথে মিত্রতা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

এই এবং অন্যান্য পার্থক্যগুলি, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব সেই সময়ে বুঝতে পেরেছিলেন, 'চীন-সোভিয়েত বিরোধ'-এর নথিতে সেগুলি বর্ণিত হয়েছে। এগুলি সবই 'মার্কস থেকে মাও' ওয়েবসাইটে ইংরেজিতে অনলাইনে পাওয়া যায়।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা বুঝতে শুরু করেছিলেন যে ক্রুশ্চেভ কীভাবে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। কিন্তু তারা জানতেন না যে ক্রুশ্চেভ স্ট্যালিন সম্পর্কে মিথ্যা বলছেন। আজ আমাদের কাছে যে সোভিয়েত আর্কাইভ রয়েছে তা তাদের কাছে ছিল না। সিসিপি নেতৃত্ব যদি জানত যে ক্রুশ্চেভ স্ট্যালিন সম্পর্কে মিথ্যা বলছেন, তাহলে সমাজতান্ত্রিক চীনের ইতিহাস হয়তো ভিন্নভাবে বিকশিত হতো।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে ঘটেনি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সামরিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে না পারার কারণে ঘটেনি, এবং অবশ্যই সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ এটির পতন চেয়েছিল বলেও ঘটেনি। এটি ভেতর থেকে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। গর্বাচেভ নেতৃত্ব নিশ্চিত ছিলেন যে, লেনিন এবং স্ট্যালিনের লক্ষ্য অনুযায়ীসময়ের সাথে সাথে সমাজতন্ত্রের সাম্যবাদে রূপান্তর প্রক্রিয়া নৈতিকভাবেই ভুল ছিল। তারা এই বিশ্বাস করেছিলেন জোসেফ স্ট্যালিন এবং 'স্ট্যালিন যুগ' সম্পর্কে মিথ্যার ভিত্তিতে।

প্রয়াত রুশ ইতিহাসবিদ আলেকজান্ডার অস্ট্রোভস্কি এই বিষয়টি এভাবে বলেছেন : এ. এন. ইয়াকোভলেভ তার স্মৃতিকথায় জর্জ বুশ এবং আরও কিছু আমেরিকান রাজনীতিবিদদের বক্তব্যের প্রতি আপত্তি জানিয়েছেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আমেরিকা শীতল যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। প্রাক্তন সোভিয়েত নেতার এই মতবিরোধের কারণ কী? দেখা যাচ্ছে যে আমেরিকানরা [সোভিয়েত ইউনিয়নকে] পরাজিত করেনি বরং সোভিয়েত নেতারা নিজেরাই তাদের দেশকে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তারা আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং আশা করেছিলেন যে এটি করার ফলে তারা [আমেরিকান নেতাদের কাছ থেকে] কৃতিত্ব পাবে।

তারা ঠিক বিশ্বের পুঁজিপতিদের মতোই ছিল, যারা বিশ্বাস করে যে, শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়া 'ভুল' এবং এটি তাদের জন্য ভুল।

গর্বাচেভ এবং ইয়াকোভলেভসহ 'তাদের নিকটতম বন্ধু এবং সমমনা ব্যক্তিদের একটি অতি-সংকীর্ণ চক্র' এবং 'কাল্পনিক নয়, বাস্তব সংস্কারকদের একটি দল' স্ট্যালিনকে আক্রমণ করার পরিকল্পনা তৈরি করেছিল। তারা স্ট্যালিন এবং সোভিয়েত ইতিহাসের স্ট্যালিন যুগ সম্পর্কে মিথ্যাচারে ভরা হাজার হাজার নিবন্ধ এবং বই প্রকাশ করে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছিল। আর স্ট্যালিন যুগ হলো সোভিয়েত ইতিহাস এবং বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসের বীরত্বপূর্ণ যুগ, এর সর্বশ্রেষ্ঠ, বিশ্ব-কাঁপানো সাফল্যের যুগ।

তারা সোভিয়েত জনগণের শ্রম দ্বারা সম্মিলিতভাবে উৎপাদিত সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে প্রকাশ্য, লুণ্ঠনকারী পুঁজিবাদে রূপান্তরিত করার ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য এটি করেছিল, যার ফলে কয়েক ডজন বিলিয়নিয়ার এবং কোটিপতি তৈরি হয়েছিল এবং সোভিয়েত শ্রমিকদের যা কয়েক দশক ধরে দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং আয়ু হ্রাসের দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

এটিকে বিশ্বের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ বাজেয়াপ্তি বলা হয়েছে। 'ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ চুরি' শব্দটি সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্মিলিতভাবে সৃষ্ট এবং পূর্বে, সম্মিলিতভাবে মালিকানাধীন, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির 'বেসরকারিকরণ' বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ন্যাটো নয়, বরং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে।

বিশ্বাসঘাতকতার এই ইতিহাস থেকে আমাদের কী শেখা দরকার?

জোসেফ স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে অপরাধের সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করা উচিত, যদি না সেগুলি প্রাথমিক-উৎস প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয়।

ক্রুশ্চেভ এবং তার লোকেরা, তারপর গর্বাচেভ, ইয়াকোভলেভ এবং তাদের লোকেরা, কেবলমাত্র একই কথার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষকে স্ট্যালিনের অস্তিত্বহীন 'অপরাধ' সম্পর্কে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল। তাদের কাছে এমন কোনও অপরাধের কোনও প্রমাণ ছিল না।

আমি কয়েক দশক ধরে প্রাক্তন সোভিয়েত আর্কাইভ থেকে নথিপত্র অধ্যয়ন করছি। আমি এখনও জোসেফ স্ট্যালিনের একটিও অপরাধের প্রমাণ পাইনি। আমার মনে হয় এটি আশ্চর্যজনক! এটি কমিউনিস্ট আন্দোলনের নৈতিক ও নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি।

আমি আপনাদের নিশ্চিত করতে পারি যে, আমি 'স্ট্যালিনবাদী' নই—সেটা যাই হোক না কেন! আমি স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অপরাধের অভিযোগ পেয়েছি তা পরীক্ষা করে দেখেছি। যদি আমি প্রমাণ পাই যে, স্ট্যালিন আসলে কোনও অপরাধ করেছেন, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমি তা প্রকাশ করব।

এমন অনেক কিছু আছে যা আমরা জানি না।

ক্রুশ্চেভ কীভাবে তার যৌবনে থাকা সময় থেকে–ধরে নেওয়া যাক–লেনিন-স্ট্যালিন ধরণের একজন সৎ বলশেভিক এমন একজন ব্যক্তি হয়েছিলেন যিনি স্ট্যালিন এবং সোভিয়েত ইতিহাস সম্পর্কে এত বিশাল পরিমাণে মিথ্যা বলবেন এবং এত বিশাল মাত্রার মিথ্যা সৃষ্টি করবেন? সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরে কী প্রক্রিয়া চলেছিল যা তাকে বদলে দিয়েছিল?

গর্বাচেভ এবং ইয়াকোভলেভের মতো নিষ্ঠুর কমিউনিস্ট-বিরোধীরা কীভাবে সিপিএসইউ-এর নেতৃত্বে উঠে এসেছিলেন?

কমিউনিস্ট দলগুলি কীভাবে ভবিষ্যতে এই ধরণের ঘটনা ঘটতে বাধা দিতে পারে?

এগুলি গুরুতর ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমি পাঠককে এগুলি নিয়ে চিন্তা করার জন্য ছেড়ে দিচ্ছি। আপনাদের সময় এবং মনোযোগের জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।

চট্টগ্রাম বন্দর বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার পাঁয়তারা বন্ধ কর

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

আহমেদ নাসু, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক নুরুল্লা বাহার, বাংলাদেশের সোস্যালিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম। বাম গণতান্ত্রিক জোট চট্টগ্রাম জেলা সমন্বয়ক অ্যাড. শফি উদ্দিন কবির আবিদের সভাপতিত্ব ও সিপিবি জেলা যুগ্ম সম্পাদক নূরুচ্ছফা ভূঁইয়ার পরিচালনায় সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন বাসদ জেলা ইনচার্জ আল-কাদেরী জয়, সিপিবি জেলা সভাপতি অশোক সাহা, গণমুক্তি ইউনিয়নের জেলা সভাপতি রাজা মিয়া, বাংলাদেশের সাম্যবাদী আন্দোলনের জেলা সমন্বয়ক শাহীন মঞ্জুর।

নেতৃবৃন্দের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সভাপতি তপন দত্ত, শ্রমিকনেতা মৃণাল চৌধুরী, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এস কে খোদা তোতন, শ্রমিকনেতা মসিউদ্দৌল্লা এবং স্কপের যুগ্ম সমন্বয়কারী রিজওয়ানুর রহমান খান। সমাবেশ শেষে একটি মিছিল পুরাতন স্টেশন থেকে শুরু হয়ে নিউমার্কেটে এসে শেষ হয়।

সমাবেশ থেকে ঘোষিত কর্মসূচি : ৯ নভেম্বর থেকে ২৩ নভেম্বর সারাদেশে বিক্ষোভ, গণসংযোগ, পদযাত্রার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় এবং ধারাবাহিকভাবে দেশের স্বার্থ বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

কমরেড শাহজাহান তালুকদার ও দাউদের শোকসভা

১১ পৃষ্ঠার পৃষ্ঠার পর

আলমগীর হোসেন দুলাল। প্রধান আলোচক ছিলেন বাসদের প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান উপদেষ্টা কমরেড খালেকুজ্জামান, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নিখিল দাস, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আবদুর রাজ্জাক, চাঁদপুর জেলা কমিটির সদস্য দিপালী রাণী, অ্যাড. মাসুদ, আব্দুল মতিন প্রমুখ। শোকসভা পরিচালনা করেন আব্দুল আজিজ।

নোয়াখালীতে অ্যাড. ইকবাল হোসেন কাজলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শোকসভায় প্রধান আলোচক ছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আবদুর রাজ্জাক, ১০ নং জোন সমন্বয়ক অর্জুন দাস, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী জেলা সভাপতি অ্যাড. মোল্লা হাবিবুর রছুল মামুন, বাসদ এর সাবেক জেলা সমন্বয়ক মতিনউদ্দিন, আ. ন. ম. জাহের উদ্দিন, জেলা সিপিবি সভাপতি শহীদ উদ্দীন বাবুল, সাধারণ সম্পাদক ডা. আবুতাহের, সাম্যবাদী আন্দোলনের নেতা তারেকশ্বর নান্টু, দাউদের বড় ছেলে খায়ের নিলয় মাসউদ। সভা পরিচালনা করেন জেলা কমিটির সদস্য নুর আলম মাস্টার। উভয় সভার আলোচকদের বক্তব্য পরবর্তী সংখ্যায় ছাপা হবে।

কমরেড শাহজাহান তালুকদার ও খায়ের ইমতিয়াজ মাসউদ দাউদের প্রয়াণে শোকসভা অনুষ্ঠিত

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

তাদের মূল্য কতখানি, আর যারা চলে গেছেন তাদের অবদানই বা কতটা তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের জীবনকে কখনোই অবহেলা করা উচিত নয়। নিজের জীবনের প্রতি অবহেলা, অতি সতর্কতা কিংবা সতর্কতাহীনতা, কৃচ্ছ্রতা বা অপচয়—এগুলোর কোনোটাই জীবনধারণের স্বাভাবিক পথ নয়। জীবনকে পরিচালিত করতে হবে একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। আমরা চাই না অবহেলা বা অযত্নের কারণে আর কোনো কমরেড হারিয়ে যাক।

নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রত্যেক মানুষই সমাজে একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনের মধ্যদিয়ে সামাজিক মূল্য সৃষ্টি করেন—যার কোনো বিনিময়মূল্য হয় না। মানুষের এই ভূমিকা নির্ধারিত হয় তার স্বপ্ন দ্বারা, পরিচালিত হয় কর্তব্যবোধ থেকে। কিন্তু অনেক সময় আমরা এই কথাগুলো কেবল আলোচনায় সীমিত রাখি, জীবনে প্রয়োগ করি না। আমরা আকাশকুসুম বা কাল্পনিক চিন্তা দিয়ে সমাজ বদলাতে চাই না; বরং আমাদের যা আছে তার মধ্য থেকেই ভালোকে গ্রহণ করে, মন্দকে দূর করে, ভালোকে আরও উন্নত করতে চাই। আমাদের লক্ষ্য হলো, মানুষকে সমাজের কাছে প্রকৃত অর্থে মূল্যবান করে তোলা। আমাদের যাপিত জীবনটা কেমন হবে—স্মরণ করি ইস্পাত উপন্যাসের পাভেলের সেই কথা—'জীবন মানুষের সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ। এই জীবন সে পায় মাত্র একবার। তাই এমনভাবে বাঁচতে হবে, যাতে বছরের পর বছর লক্ষ্যহীনভাবে কাটানোর যন্ত্রণাভরা অনুশোচনায় ভুগতে না হয়; এমনভাবে বাঁচতে হবে, যাতে মৃত্যুর মুহূর্তে মানুষ বলতে পারে—আমার সমগ্র জীবন ও সমগ্র শক্তি আমি নিয়োজিত করেছি পৃথিবীর সবচেয়ে মহান আদর্শ, মানুষের মুক্তির সংগ্রামে।'

নেতৃবৃন্দ বলেন, আমাদের জীবন যেমন পার্টির জন্যই তেমনি সমাজের জন্যও মূল্যবান। আমাদের সময়-অর্থ, স্বাস্থ্য এবং সংস্কৃতি–কোনো কিছুই যেন অপচয় না হয়। আমাদের পার্টির জীবনে যখনই কঠিন আঘাত এসেছে, এই কমরেডরাই সংগঠনের পতাকা হাতে নিয়ে আগলে রেখেছেন, ঝড় মোকাবিলা করেছেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে গেছেন। শোষিত মানুষের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য প্রয়োজন একটি সঠিক ও সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি, যা এই দুই কমরেড তাদের জীবনে খুঁজে পেয়েছিলেন এবং আঁকড়ে ধরেছিলেন। সে দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শন। কমরেডদের হারানোর বেদনাকে আমরা শুধু শোকের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ রাখব না, বরং এটিকে একটি বিপ্লবী দায়িত্বে রূপান্তরিত করব। যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের আর কিছুই দেওয়ার নেই, কিন্তু তারা যা রেখে গেছেন তা সংগ্রামের এক অমূল্য শিক্ষা।

বিপ্লবী রাজনীতিতে সারল্য-সততা, বিনয়-মিতব্যয়িতা, সংযম এবং পার্টির প্রতি আনুগত্য যেমন অপরিহার্য, তেমনি নিজেকে যোগ্য ও দলের জন্য প্রয়োজনীয় করে গড়ে তোলাও গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হলে নিজেদের কাজে আরও দক্ষ, জ্ঞানে সমৃদ্ধ ও দলের কাজকে সংহত ও বিস্তৃত করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, আমাদের কমরেডের সংগ্রামী জীবন, দৃঢ় সাহস, সহজসরল জীবনযাপন, শত্রুর প্রতি কঠোর, শ্রমজীবী মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা, মানুষের প্রতি ভালোবাসা, কাজের প্রতি একনিষ্ঠতা, জানার জন্য তৃষ্ণা, সত্যের অনুসন্ধান এবং শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলার অদম্য স্পৃহা—এসবই আমাদের জন্য অনুসরণীয়। আমাদের মধ্যেও অনেকেই আছেন, যাদের জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণের সামর্থ্য আছে, তবুও কেন দলের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেন না? এই দুর্বলতা কি আমাদের মাঝেও নেই? কীসে আমরা আটকে আছি যে, নিজেদেরকে প্রকৃত বিপ্লবী হিসেবে গড়ে তুলতে পারছি না? আজ এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করাটা আমাদের জন্য জরুরি।

এই সংগ্রাম কি একা একা করা সম্ভব? সম্ভব নয়। এই সংগ্রাম করতে হবে যৌথভাবে। এর জন্য দরকার শক্তিশালী সংগঠন, সাংগঠনিক শক্তির বিকাশ। আগামী দিনে আমাদের রাজনীতির সামনে অনেক জটিল পরিস্থিতি ও ঝুঁকির পরিস্থিতি আসবে। তাই আমাদেরকে অবশ্যই সংগঠনের শক্তিকে আরও সংহত ও বিস্তৃত করতে হবে, নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বুঝাপড়া ও ঐক্য দৃঢ় করতে হবে এবং মানুষের সামনে আমাদের যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত বক্তব্য উপস্থাপন করতে হবে। এই কর্তব্য সাধনের মাধ্যমেই প্রয়াত কমরেডদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা দেখানো সম্ভব হবে। আমাদের সংগ্রামেই বেঁচে থাকবেন কমরেড দাউদ ও কমরেড শাহজাহান। কমরেড শাহজাহান তালুকদার ও কমরেড খায়ের ইমতিয়াজ মাসউদ দাউদ লাল সালাম।

উল্লেখ্য, কমরেড শাহজাহান তালুকদার এর আরও একটি শোকসভা ১০ নভেম্বর চাঁদপুর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত হয় এবং কমরেড খায়ের ইমতিয়াজ মাসউদ দাউদ এর শোকসভা ১৪ নভেম্বর নোয়াখালী জেলার সিকো বাজার ও সুপার হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়।

চাঁদপুরের শোকসভায় সভাতিত্ব করেন, শোকসভা আয়োজন কমিটির আহ্বায়ক কমরেড

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

দেশের স্বার্থে লালদিয়া, চট্টগ্রাম বন্দরসহ বিভিন্ন টার্মিনাল বিদেশি কোম্পানিকে ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে ১৬ নভেম্বর '২৫ ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমাবেশ শেষে মিছিল

১৪ নভেম্বর চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সিলেট জেলার দ্বিতীয় কাউন্সিল শারদা হল সংলগ্ন মহড়া কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলে সভাপতি-নাজিকুল ইসলাম রানা, সহসভাপতি মাসুদ রানা, জহর কুমার সিংহ, সাধারণ সম্পাদক মলয় চক্রবর্তী ও সাংগঠনিক সম্পাদক স্বপন তালুকদার নির্বাচিত হয়

মুক্তিযুদ্ধ ও গণ অভ্যুত্থানের চেতনায় বাম বিকল্প গড়ার আহ্বান

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

থেকে বেড়ে ৪৫০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। অথচ একজন দিনমজুর আজও দৈনিক ৫০০ টাকার জন্য কাজ খোঁজে, একজন রিকশাচালক তার রিকশা বাঁচাতে লড়াই করে। একজন চা-শ্রমিকের দৈনিক মজুরি মাত্র ১৭৮ টাকা।

তিনি বলেন, শোষকরা সব সময়ই ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে। ব্রিটিশরা হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা লাগিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিভ্রান্ত করেছিল। পাকিস্তানিরাও একই পথে হেঁটেছে। '৭১-এ জামাত-শিবির বলেছিল, 'পাকিস্তান আল্লাহর ঘর, ভাঙা যাবে না,' কিন্তু আমরা জবাব দিয়েছি: 'আল্লাহ কি শোষণ ও অন্যায় সহ্য করেন?'

আমাদের শ্রমিকরা আজও লড়ছে–ন্যূনতম মজুরির জন্য, শ্রমিকের জীবনের নিরাপত্তার জন্য, কৃষকের ফসলের ন্যায্য দামের জন্য, নারীর সমমর্যাদার জন্য, ধর্মীয় সংখ্যালঘুর নিরাপত্তার জন্য। আমরা গাজা, আফগানিস্তান, ভিয়েতনাম, কিউবা, উত্তর কোরিয়ার মানুষের পাশেও দাঁড়িয়েছি।

আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে একজন গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন–এটি প্রমাণ করে মানুষ মুক্তি চায়, পরিবর্তন চায়। আমরাও চাই–কেউ ধর্মের কারণে, লিঙ্গের কারণে, বয়সের কারণে অবহেলিত না হোক।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে একটি সমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি রয়েছে, যা বারবার ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে আমরা সেই সংস্কৃতি রক্ষার লড়াই চালিয়ে যাব। গত ৪৫ বছর দেশের প্রতিটি সমস্যায় আমরা লড়াই করেছি, আরও ৪৫ বছর লাগলেও আমরা লড়ব–মানুষের মুক্তি না আসা পর্যন্ত এই সংগ্রাম থামবে না। আমাদের ওপর নিপীড়ন-নির্যাতন, গ্রেপ্তারি যাই আসুক না কেন শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি না আসা পর্যন্ত লড়াই থামবে না।

ভাষা সংগ্রামী আহমদ রফিকের মৃত্যুতে শোক

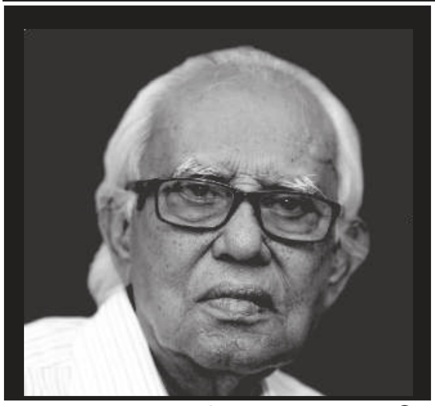

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ৩ অক্টোবর সংবাদপত্রে দেওয়া এক বিবৃতিতে ভাষা সংগ্রামী ও লেখক গবেষক আহমদ রফিকের মৃত্যুতে গভীর শোক ও শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যবৃন্দ, গুনগ্রাহী ও শোকাহত আত্মীয় স্বজন, বন্ধুদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে কমরেড ফিরোজ বলেন, আহমদ রফিক ছিলেন ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক, প্রাবন্ধিক-লেখক ও গবেষক। তিনি শিক্ষাজীবনে ভাষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণ অভ্যুত্থান এবং মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণসহ এদেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছেন। তিনি ছিলেন প্রগতিশীল বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার মানুষ। তাঁর চিন্তা ও কর্মের মাধ্যমে তিনি সমাজ প্রগতির সংগ্রামে নিয়োজিত নেতা কর্মীদের ও সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করেছেন।

তাঁর মৃত্যুতে আমরা বামপন্থি আন্দোলনের একজন অভিভাবককে হারালাম। আহমদ রফিক লাল সালাম!

কমরেড মনিরুজ্জামান খান মনির মৃত্যুতে শোক

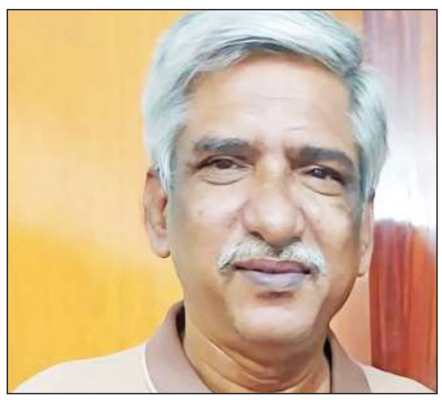

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ২৭ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বাসদ সিরাজগঞ্জ জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মনিরুজ্জামান খান মনির মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যবৃন্দ, শোকাহত আত্মীয় স্বজন, সহযোদ্ধাদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন। কমরেড মনিরুজ্জামান খান মনি ২৭ অক্টোবর এক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন।

বিবৃতিতে কমরেড ফিরোজ বলেন, কমরেড মনি দলের সাথে একাত্ম হয়ে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন, গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও দল গড়ে তোলার সংগ্রামে ছাত্র অবস্থা থেকে দলের সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে আমরা দলের একজন ঘনিষ্ট কর্মী হারালাম এবং দেশের শ্রমিকশ্রেণি ও বামপন্থি আন্দোলন একজন বন্ধুকে হারালো। কমরেড মনি লাল সালাম।

ইলা মিত্রের জন্মশতবার্ষিকীতে কৃষক-আদিবাসী ও নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

শেষপৃষ্ঠার পর

পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের কীর্তিনাশা আধিপত্য বিস্তারের অভিযান চলছে, আমাদের দেশে পালাক্রমে লুটতরাজের ধারা শান্তি-সভ্যতা, সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্যকে ধুলায় লুটিয়ে দিচ্ছে, তখন ফকির মজনু শাহ, সিধু-কানু, চাঁদ ভৈরব, সূর্যসেন, প্রীতিলতা, আসফাকুল্লাহ, সামছুজ্জোহা, আসাদ, মনু মিয়া, সার্জেন্ট জহুর, আজাদ-রুমী, '৭১ এর শহিদ বুদ্ধিজীবীগণ, কর্নেল তাহের, সিরাজ সিকদার, জয়নাল, জাফর, ডা. মিলন, নূরহোসেন, আবু সাঈদ, মুগ্ধসহ অসংখ্য শহিদদের স্মৃতি সামনে আনা দরকার। অপসংস্কৃতি ও সুবিধাবাদের প্রবল জোয়ার ঠেকিয়ে এগিয়ে যাওয়ার তাগিদে ইলা মিত্র 'রানি মা'কে স্মরণের স্মৃতি মন্দির থেকে সামনে দৃশ্যমানতায় আনা দরকার। আমাদের দেশের কৃষক-আদিবাসী, শ্রমজীবী-পেশাজীবী, ছাত্র, জনতার নব জাগরণের প্রয়োজনে। শুধু ক্ষমতার হাতবদল নয়, ব্যবস্থা বদলের তথা মুক্তিযুদ্ধের মৌল চেতনা সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে কৃষক রাজ-শ্রমিক রাজ কায়েম করার তাগিদে। সেই শপথে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট এবং সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের উদ্যোগে আজকের এই অনুষ্ঠানে উজ্জ্বল দিনের উপস্থিতিকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে ব্রিটিশ-পাকিস্তান উপনিবেশিকতা বিরোধী ও স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তি অন্বেষায় আত্মোৎসর্গকারী সংগ্রামীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করে আমি আজকের এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। জয় সমাজতন্ত্র। জয় জনতার জয়।

সমাবেশে প্রধান বক্তা কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেন, আজ আমরা একজন বিপ্লবী—কমরেড ইলা মিত্রের জন্মশতবার্ষিকী স্মরণের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছি। তাঁর জীবন ছিল ন্যায়, সাম্য ও মানবিকমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য নিবেদিত, বীরত্বপূর্ণ সাহসী ও সংগ্রামে অনন্য নজির স্থাপনকারী। ইলা মিত্র কেবল একজন নারীনেত্রী বা তেভাগা আন্দোলনের যোদ্ধাই ছিলেন না; তিনি ছিলেন সমাজ বদলের এক অকুতোভয় সৈনিক। যাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল শোষণ-বঞ্চনা, নিপীড়ন ও দুঃশাসনের কবল থেকে মানবমুক্তির লড়াইকে অগ্রসর করা।

ইলা মিত্র যখন তেভাগা আন্দোলন করেন তখন বেশিরভাগ কৃষকেরই নিজস্ব জমি ছিল না। তারা জমিদার ও মহাজনের জমি বর্গায় চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হতো। তখন গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর চাষাবাদ ছাড়া জীবিকা নির্বাহের অন্য কোনো উপায় ছিল না। শিল্পকারখানা বলতে তেমন কিছুই ছিল না। শহরকেন্দ্রিক সামান্য কিছু শিল্পকারখানা ছিল, সেখানে অল্প কিছু মানুষের কর্মসংস্থান হতো। বর্গাপ্রথায় জমির সমস্ত ফসল মালিকের গোলায় উঠত এবং ভূমিহীন কৃষক বা ভাগ-চাষির জন্য উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক বা তারও কম পেত। যদিও ফসল ফলানোর জন্য বীজ-সার, কীটনাশক ও শ্রম সবটাই দিত ভূমিহীন ও বর্গা চাষি। বৃষ্টিতে ভিজে, রোদে পুড়ে, শীত-গ্রীষ্মকে উপেক্ষা করে কৃষকরা যে ফসল পেত তা দিয়ে তিন বেলা পেটপুরে খেতে পারতো না। তখন কৃষক দাবি করল ফসলের তিনভাগের দুইভাগ তাদের দিতে হবে—এই দাবি থেকেই আন্দোলনের নাম হয়ে উঠে 'তেভাগা আন্দোলন'।

১৯৪৩ সালে বাংলায় যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও মহামারি দেখা দেয় তাতে প্রায় ৩০ লাখ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। এর প্রভাব চলে আরও কয়েক বছর। ফলে, কৃষকের জীবনে স্থায়ী রূপ নেয় অভাব-অনটন, দুর্ভিক্ষ-মহামারি, বঞ্চনা, নিপীড়ন আর অত্যাচার। জমিদারের সাথে ফসল উৎপাদনের কোনো সম্পর্ক না থাকায় কৃষক ও জমিদারদের মাঝে জোতদার নামে একটি মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। এরা জমিদারদের কাছ থেকে জমি ইজারা নিয়ে কৃষকদের মাধ্যমে চাষ করাত এবং খাজনা আদায় করত। জমির জরিপ না করেই রাজস্ব নির্ধারণ করা হতো। ফলস্বরূপ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জমির তুলনায় রাজস্বের হার অনেক বেশি হতো।

নানামুখী অন্যায়-অত্যাচারে জর্জরিত বর্গাচাষিরা এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠে। ১৯৪৬-৪৭ সালে ফসলের দুই-তৃতীয়াংশের উপর কৃষকের মালিকানা প্রতিষ্ঠার দাবিতে বাংলার অধিকাংশ জেলায় গড়ে ওঠে তেভাগা আন্দোলন, যা চলেছিল ১৯৪৯-৫০ সাল পর্যন্ত। তেভাগার দাবিতে রাজশাহী জেলার, বিশেষভাবে নাচোলের কৃষকদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ইলা মিত্র অবিস্মরণীয় ভূমিকা রাখেন। তিনি ছিলেন কৃষক-খেতমজুর, আদিবাসীদের সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক–যিনি আদিবাসী-সাঁওতাল, কৃষক ও ছাত্রদের জমিদার, মহাজনদের শোষণ, নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সচেতন করেছিলেন, সংগঠিত করেছিলেন।

কমরেড ফিরোজ বলেন, ইলা মিত্র আমাদের শিখিয়েছেন, একজন মানুষের জীবন কেবল ভোগ-বিলাসে কাটিয়ে দেওয়ার জন্য নয়। সত্যিকারের মর্যাদাবান মানুষের আসল কাজ হলো অন্যায়ের বিরুদ্ধে, জুলুমের বিরুদ্ধে, নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। মানুষের মৌলিক অধিকার, বাঁচার অধিকার, মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপনের অধিকার আদায়ের লড়াইয়েই প্রকাশ পায় সত্যিকারের মনুষ্যত্ব।

তিনি বলেন, ইলা মিত্র ছিলেন জমিদার পুত্রবধূ এবং উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান। বামপন্থি রাজনীতির সংস্পর্শে আসার আগে ক্রীড়াক্ষেত্রে তাঁর ছিল প্রায় আকাশচুম্বী কৃতিত্ব। সক্রিয় বামপন্থি রাজনৈতিক নাচোলের জমিদার পরিবারের সন্তান কমিউনিস্ট নেতা রমেন মিত্রের সঙ্গে বিয়ে, সেই সূত্রে দেশবিভাগের আগে তাঁর পূর্ববঙ্গে আগমন এবং স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে কৃষকদের তেভাগা আন্দোলন সংগঠিত করেন। তিনি নাচোল-গোমস্তাপুরের কৃষক-আদিবাসীদের অধিকারের জন্য লড়াই করেছেন। শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু, অকথ্য নির্যাতনও তাঁকে মাথা নত করাতে পারেনি। শুরুতে স্থানীয় মানুষ তাঁকে বিশ্বাস করেনি, ভেবেছে—ধনী পরিবারের সদস্য কীভাবে গরিবের পক্ষে কাজ করতে পারে? কিন্তু ইলা মিত্র বিশ্বাস অর্জনের জন্য এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সাঁওতালদের ঘরে থেকেছেন, তাদের খাবার খেয়েছেন, তাদের ভাষা শিখেছেন, ভালোবাসা দিয়ে, মমত্ব দিয়ে মনুষ্যত্ব বোধে, সংগ্রাম করে তাদের আস্থা অর্জন করেছেন। এভাবেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন সাঁওতাল ও কৃষকদের 'রানি মা'। তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকার ইলা মিত্রকে আন্দোলনের কারণে গ্রেপ্তার করে তাঁর ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়, জেলে বন্দি করে আন্দোলনকে কঠোরভাবে দমন করে।

কমরেড ফিরোজ আরও বলেন, আমরা যে বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখি—একটি শোষণমুক্ত, ন্যায়ভিত্তিক শোষণহীন সাম্যের সমাজ—তার জন্য ইলা মিত্রের মতো সংগ্রামীদের জীবন-সংগ্রাম আমাদের পথ দেখাবে। তাঁর ত্যাগ ও সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিয়ে আজকের দিনের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে আমরা দাঁড়াতে চাই।

তিনি বলেন, আজকে বাংলাদেশের কৃষক, আদিবাসী, সাঁওতাল ও পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর কী দশা? তারা দারিদ্র্য, অভাব ও মর্যাদাহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। এতদিন ভারতে কৃষকদের আত্মহত্যার ঘটনা আমরা দেখেছি, এখন সেটা বাংলাদেশেও দেখছি। মহাজনি ঋণের দায়ে ও ফসলের ন্যায্যমূল্য না পেয়ে ২৬ মার্চ '২৫ মেহেরপুরের সাইফুল শেখ পেঁয়াজ খেতেই বিষ পান করে আত্মহত্যা করেন। গত ১৯ এপ্রিল সিরাজগঞ্জের হাসেম ওরফে পলান এনজিও ও মহাজনের কাছ থেকে নেওয়া ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে বিষপানে আত্মহত্যা করেন। ১৮ আগস্ট রাজশাহীর মোহনপুরে আকবর হোসেন ৪ লাখ টাকা ঋণের দায়ে নিজের পানের বরজে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। (সমকাল, ১৮ আগস্ট '২৫); পবা উপজেলার কৃষক মিনারুল ১৪ আগস্ট '২৫ স্ত্রী ও দুই সন্তানকে হত্যা করে নিজে আত্মহত্যা করেন। আত্মহত্যার আগে চিরকুটে লিখে গেছেন 'আমরা মরে গেলাম ঋণের দায়ে আর খাওয়ার অভাবে। এত কষ্ট আর মেনে নিতে পারছি না। (প্রথম আলো ১৫ আগস্ট ২০২৫)। চাষের জমির পানি না পাওয়ার অপমানে–অভিনাথ মার্ডি, রবি মার্ডি, সোনা মিয়া, সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে কৃষক শফিক আলম শাহ ঋণের দায় থেকে মুক্তির জন্য আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন। এই যে একের পর এক কৃষক আত্মহত্যা করছে রাষ্ট্র ও সরকার এ ব্যাপারে নির্বিকার। ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে জমিজমা বিক্রি করে পালিয়ে শহরে চলে এসে বস্তিতে ঠাঁই নেয়। ঋণগ্রস্ত কৃষকেরা কৃষি ছেড়ে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, কৃষককে প্রদানকৃত সরকারি কৃষি ব্যাংকের ঋণের সুদ ৯ শতাংশ কিন্তু ঋণ প্রদানের পরিমাণ মোট কৃষি ঋণের মাত্র ৬ শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রায় ৩৮ হাজার কোটি টাকা কৃষিঋণের পরিমাণ নির্ধারণ করে দিলেও অধিকাংশ বেসরকারি ব্যাংক তা মানছে না। আর ৮১ শতাংশের বেশি কৃষক এনজিও, আত্মীয়স্বজন, বেসরকারি ব্যাংক ও দাদন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ঋণ নেয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকের সুদ যেখানে ১২-১৩ শতাংশ সেখানে এনজিও ঋণের সুদ ১৯ থেকে ৬৩ শতাংশ পর্যন্ত। ঋণ নেওয়ার পরের সপ্তাহ থেকে কিস্তির টাকা পরিশোধ শুরু করতে হয়। কৃষকরা তখন কিস্তি কোথা থেকে দিবে? যেমন, টমেটোর বীজ লাগানো থেকে শুরু করে টমেটো পাকা পর্যন্ত সময় লাগে ৯০ থেকে ১২০ দিন। আলু উৎপাদনে একই পরিমাণ সময় লাগে; লাউ উৎপাদনে সময় লাগে প্রায় তিন মাস। ফসল উঠার আগে তো কৃষকের হাতে নগদ টাকা আসার সুযোগ নেই কিন্তু ঋণের কিস্তি প্রদান শুরু হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে কৃষক আরেক এনজিও থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। ঋণ করা ছাড়া ঋণ শোধের অন্য কোনও উপায় থাকে না। ঋণ দেওয়ার প্রথম সপ্তাহ থেকে ঋণ আদায়কারীরা কৃষকের দরজায় বসে থাকে। নানাভাবে হয়রানি করতে থাকে।

কমরেড ফিরোজ বলেন, কৃষিজমির মালিকানার ব্যাপার বৈষম্য তৈরি হয়েছে। আন্তর্জাতিক খাদ্যনীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইএফপিআরআই) তথ্য অনুযায়ী, দেশে ৫৬ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারের কোনো জমি নেই। শূন্য দশমিক ৫ একরের কম জমির মালিক প্রান্তিক চাষির হার ৪১ শতাংশ, যারা মাত্র ১১ শতাংশ ভূমির মালিক। অন্যদিকে ২ দশমিক ৫ একরের বেশি জমির মালিক বড় কৃষকের হার ৬ শতাংশ, যারা মোট কৃষিজমির এক-চতুর্থাংশের মালিক। ৪০ শতাংশ চাষি জমি বর্গা নিয়ে বা ভাড়া নিয়ে চাষাবাদ করেন। এই ভূমিহীন কৃষকদের জমির মালিকদের অনেক ক্ষেত্রেই ফসলের অর্ধেক দিয়ে দিতে হয়। ফলে তাদের আর তেমন কিছু থাকে না। এ ছাড়া সারাদেশে ৬২ হাজার একরের বেশি খাসজমি অবৈধ দখলে রয়েছে, যেগুলো উদ্ধার করে ভূমিহীনদের মাঝে বণ্টন করা প্রয়োজন। ডিলাররা কৃত্রিম সংকট তৈরি করে সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে ৩০-৫০ শতাংশ বেশি দামে সার কিনতে কৃষকদের বাধ্য করে। সার-বীজ, কীটনাশক, সেচের পানিসহ কৃষি উপকরণের দাম বৃদ্ধির ফলে কৃষকের উৎপাদন ব্যয় প্রতিনিয়ত বেড়ে চলছে কিন্তু কৃষক তার ফসলের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে না। কোল্ডস্টোরেজ সিন্ডিকেট মালিকদের দখলে। কৃষকরা ফসলের মৌসুমে বিক্রি করতে গিয়ে ঠকছেন, আবার যখন এদের ঘরে ফসল থাকে না তখন তাদের বাড়তি দামে কিনতে হচ্ছে। গত বছর আলুর দাম বেশি থাকায় কৃষক এ বছর আলু উৎপাদন বাড়িয়েছে কিন্তু এবছর দাম গেছে কমে। তাই তারা খরচও তুলতে পারছে না। এভাবেই তারা সর্বশান্ত হচ্ছেন। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন এই সরকার এনজিও-মহাজন স্বার্থরক্ষাকারি সরকার।

তিনি বলেন, ২০২৪ সালের জুলাই মাসে চাকরির কোটা সংস্কার আন্দোলন দিয়ে শুরু হয়ে একপর্যায়ে ছাত্র-শ্রমিক, জনতার ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে ৫ আগস্ট গণ অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়। সে অভ্যুত্থানে ২৮৪ জন শ্রমিক, ১৬৮ জন পথশিশু ও ১২৪ জন ক্ষুদে ব্যবসায়ী তথা হকার জীবন দিয়েছে। এত জীবন দানের পরও তারা উপেক্ষিত। মানুষ জীবন দিয়ে ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারকে উচ্ছেদ করেছে এখন নতুন লুটেরা এসেছে এবং আগামী দিনের এই লুটের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে ব্যবস্থাপত্র তৈরিতে ব্যস্ত আছে।

আজকে শুধু কৃষক নয়, শ্রমিকরাও তাদের ন্যূনতম মজুরি ও বকেয়া বেতন, ভাতার দাবিতে রাস্তায় নেমে গুলি খাচ্ছে। নীলফামারী ইপিজেডে শ্রমিকরা কারখানা খুলে দেওয়া ও বকেয়া মজুরি দাবি করলে পুলিশ শ্রমিক হাবিব ইসলামকে গুলি করে হত্যা করে। গত বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর আশুলিয়ায় গুলিতে নিহত হন কাওসার হোসেন খান। এক মাস পর অক্টোবরে একই এলাকায় হয়ে মারা যায় গুলিবিদ্ধ শ্রমিক চম্পা খাতুন।

তিনি বলেন, শিক্ষাব্যবস্থায়ও চলছে আজ চরম সংকটে। সাম্প্রতিক ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফলাফল তার জ্বলন্ত প্রমাণ। ২০২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একজনও পাস করেনি। গত বছর যেখানে ৭৮ শতাংশ পাস করেছে এবার পাসের হার ৫৮%-এ নেমে এসেছে। এর দায় শুধু শিক্ষার্থীদের নয়, দায়ী এই ভঙ্গুর শিক্ষাব্যবস্থা এবং সরকারের ব্যর্থ নীতি। শিক্ষকরা এমপিও ভুক্তির ((Monthly Pay order)) দাবিতে আন্দোলন করলে ও বেতন বৃদ্ধির দাবি জানালে তাদের নির্যাতন করা হয়।

কমরেড ফিরোজ বলেন, একটা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন তার ভিত্তিতে গণ অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়েছে। শিক্ষা খাতে যে চরম বৈষম্য তা অবসানে এ সরকারের পক্ষ থেকে কোন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। আজকে সমাজের সর্ব ক্ষেত্রে বৈষম্য বিরাজ করছে। আমরা বলছি মুখে বৈষম্য বিলোপের কথা বললে বৈষম্য বিলোপ হয় না বৈষম্য বিলোপ করতে হলে সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে তা না হলে বৈষম্য বিলোপ হবে না। আর সেই বৈষম্য বিলোপের জন্য দরকার বৈষম্য বিলোপের আদর্শভিত্তিক দলের নেতৃত্বে রাষ্ট্র পরিচালনা করা। সেই আদর্শ হলো মানব মুক্তির দর্শন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। সে আদর্শের উপর ভিত্তি করে একটি বিপ্লবী দল গড়ে তুলতে হবে। বাসদ সেই সংগ্রাম করছে। তাই বাসদের পতাকাতলে মিলিত হয়ে মুক্তির সংগ্রাম সমাজতন্ত্র সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম সেই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বৈষম্য বিলোপ হবে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া মুক্তি আসবে না। সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ ছাড়া মানবজাতির ইতিহাসে বৈষম্য বিলোপের নজিরও কেউ দেখাতে পারবে না।

কমরেড ফিরোজ আরও বলেন, দেশে এখন সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হলো জুলাই সনদ। কী এই জুলাই সনদ? জুলাই সনদ হচ্ছে '২৪-এ সংঘটিত গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সংস্কারের যে দাবি ওঠেছিল তারই একটি দলিল। অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে সংস্কারের লক্ষ্যে ১১টি সংস্কার কমিশন করেছে। তার মধ্য থেকে ছয়টি কমিশনের সুপারিশকৃত রিপোর্ট নিয়ে জাতীয় রাজনৈতিক দলসমূহের

এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

চট্টগ্রাম বন্দর বিদেশি কোম্পানির হাতে ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার কর

১৪ পৃষ্ঠার পর

আমদানি রপ্তানি হয়ে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশ কি এইসব দেশের মত? যে দেশের শিল্পের কাঁচামাল পুরোটাই আমদানি নির্ভর, জ্বালানির উপর বিদেশী নির্ভরতা বেশি, রপ্তানির ৮০ শতাংশ গার্মেন্টস পণ্য, খাদ্য এবং ভোজ্য তেল আমদানি করতে হয়, সেই দেশ তার একমাত্র বন্দর নিয়ে ঝুঁকি নিতে পারে কি? পাশাপাশি এই অঞ্চলের বাণিজ্যের কথা ভাবলে ভূরাজনৈতিক, সামরিক বিষয়টাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ফলে লাভের আশায় একমাত্র বন্দরকে বিদেশিদের হাতে তুলে দিয়ে দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি ও ফাঁদে পড়বে কিনা তা গভীরভাবে ভাবা দরকার।

বন্দরের সক্ষমতা, আমাদের দক্ষতা কম, তাই বিদেশিদের দিতে হবে–সম্পদ দখলের এ হলো পুরনো কৌশল সক্ষমতা নির্ভর করে অনেক কিছুর উপর। সেসব বিবেচনায় না নিয়ে বিদেশিদের কাছে তুলে দেয়া উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। চট্টগ্রাম বন্দরের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু একথা ভাবতে হবে, বন্দরের কর্মদক্ষতা কেবল অপারেশন ও ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভর করে না, ভৌগোলিক অবস্থান ও কাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার ওপরও নির্ভর করে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্ণফুলী নদীর তীরে একটি সরু চ্যানেলে অবস্থিত, যেখানে পানির গভীরতা (ড্রাফট) প্রায় ৯ দশমিক ৫ মিটার যা আবার জোয়ার-ভাটার কারণে কম-বেশি হয়। ফলে চাইলেই বড় জাহাজ এখানে ভিড়তে পারে না। পানির অগভীরতার পাশাপাশি কর্ণফুলী নদীর সরু চ্যানেল, তীক্ষ্ণ বাঁক ও জোয়ার- ভাটার পরিবর্তন জাহাজ চলাচলে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ফলে জাহাজের ‘টার্ন-অ্যারাউন্ড টাইম’ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। অবস্থানগত এই সীমাবদ্ধতার কারনে চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে সিঙ্গাপুর বা কলম্বো বন্দর তুলনা করাটা অযৌক্তিক।

আধুনিক স্ক্যানিং প্রযুক্তি ও ডিজিটাল সিস্টেমের অভাবে চট্টগ্রাম বন্দরে কাস্টমস ক্লিয়ারেন্সে ৭ থেকে ১০ দিন সময় লাগে। অবকাঠামো ও গুদাম ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা, প্রযুক্তিগত দক্ষতার ঘাটতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এসব দুর্বলতা দূর না করে সব দায় কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এর উপর চাপানো এবং বিদেশিদেরকে দেয়ার ওকালতি করা দুরভিসন্ধিমূলক।

বহুজাতিক কোম্পানির হাতে বন্দর, দেশে দেশে অভিজ্ঞতা ভালো নয়

বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, আইএফসি, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকসহ আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলোর নীতি হচ্ছে ঋণ দাও, অসহায় করে রাখো এবং লুণ্ঠন কর। তারা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বৈদেশিক বিনিয়োগের নামে কৌশলগত খাতগুলোতে বেসরকারিকরণে উৎসাহ দেয় এবং পরিণামে জাতীয় স্বার্থ ধ্বংস করে। জিবুতি, কেনিয়া এর অন্যতম উদাহরণ। যে বিশ্বব্যাংক বেসরকারিকরণের প্রধান প্রবক্তা তারাই বলেছে, যেসব অবকাঠামো প্রকল্পে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) বা বেসরকারিকরণ বাস্তবায়িত হয়েছে, সেগুলোর ৪২ শতাংশ ক্ষেত্রে আর্থিক ঝুঁকি ও দায় শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রকেই বহন করতে হয়েছে। শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইন ও কেনিয়ার মতো দেশের অভিজ্ঞতা বলছে, বিদেশি কোম্পানিকে কৌশলগত খাতের নিয়ন্ত্রণ দিলে স্থানীয়দের ক্ষমতা দুর্বল হয় এবং স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা কমে যায়।

দেশের বন্দর বিদেশিদের কাছে ইজারা দেওয়া হবে, কিন্তু দেশের মানুষ জানবে না কেন?

দুবাইভিত্তিক কোম্পানি ডিপি ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে ইজারার শর্তাবলিসহ অন্যান্য টার্মিনালের ইজারার শর্ত জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি। সরকারের মেয়াদ আছে আর ছয় মাস কিন্তু ২৫-৩০ বছরের চুক্তি করতে এতো আগ্রহের কারণ কী? বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা বলছে, বিদেশি অপারেটর নিয়োগে বন্দরের দক্ষতা বাড়লেও কনটেইনার চার্জ বৃদ্ধি, শ্রমিক অধিকার সংকোচন, কৌশলগত তথ্যঝুঁকি এবং আন্তর্জাতিক বিরোধের আশঙ্কা বাড়ে। এ কারণেই কি ইজারা দেয়ার আগেই বন্দরের ট্যারিফ বাড়িয়ে দেয়া হলো, যাতে বিদেশিদের উপর দায় না পড়ে। বেসরকারিকরণের উদ্দেশ্য মুনাফা বৃদ্ধি। ফলে বন্দর পরিচালনার ব্যয় ২০-৪০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যাবে।

ভারতের মুন্দ্রা ও শ্রীলঙ্কার হামবানটোটা বন্দরে বিদেশি অপারেশনের অধীন কনটেইনার চার্জ ২০-৩০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে, যা আমদানি রপ্তানিতে ব্যয় বৃদ্ধি ও উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি ও বৈদেশিক বাণিজ্য দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে আর এই প্রবৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি অপরিহার্য। এর জন্য প্রয়োজন একটি সুসমন্বিত বহুমাত্রিক রোডম্যাপ; যেখানে অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রযুক্তির আধুনিকায়ন, দক্ষ মানবসম্পদ গঠন এবং নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার। কাস্টমস প্রক্রিয়া, অপারেশনাল ব্যবস্থাপনা, শ্রমিক ব্যবস্থাপনা এবং পণ্য পরিবহন ও গুদামজাতকরণসহ সমগ্র লজিস্টিকস শৃঙ্খলকে আধুনিক ও কার্যকর করতে হবে একটি সমন্বিত পদ্ধতির মাধ্যমে।

দেশের হৃৎপিণ্ডে বিদেশিদের থাবা প্রয়োজন রুখে দাঁড়ানো

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন চট্টগ্রাম বন্দর বাংলাদেশের হৃৎপিণ্ড। কথাটা ঠিক। কিন্তু তার কাজটা তো বিপজ্জনক। শরীরের রক্ত প্রবাহের মতো অর্থনীতি হলো দেশের রক্ত প্রবাহ। হৃৎপিণ্ড সবল না হলে যেমন শরীরের রক্ত সঞ্চালন ব্যাহত হয়, তেমনি এই বন্দর দুর্বল হলে, ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবস্থায় পরিচালিত হলে দেশের অর্থনীতির কর্মকাণ্ডে ব্যাঘাত ঘটবে, দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই হৃৎপিণ্ডে যদি বিদেশিদের থাবা পড়ে তাহলে অর্থনৈতিকভাবে জিম্মি হয়ে পড়বে দেশ।

তাই হৃৎপিণ্ডকে শুধু সবল করা নয় অন্যের দখল থেকে রক্ষা করাও দরকার। ফলে বন্দর সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত কেবল অর্থনৈতিক নয়, কৌশলগত এবং এর সঙ্গে জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তা এবং সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন জড়িত। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় ডিপি ওয়ার্ল্ডের সাথে মার্কিন নৌবাহিনীর চুক্তি রয়েছে। সেই চুক্তির বলে সারা পৃথিবীতে যে সকল বন্দর পরিচালনার দায়িত্ব ডিপি ওয়ার্ল্ডের রয়েছে সেইসব বন্দরে যে কোন সময় মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ তার মেরামত ও রিফুয়েলিং এর জন্য নোঙর করতে পারবে। এজন্য ডিপি ওয়ার্ল্ডকে ইজার দেওয়া কতটা ভয়ংকর হতে পারে তা কল্পনার অতীত। তাছাড়া একথাও শুনা যাচ্ছে বন্দর বিদেশি কোম্পানিকে ইজারা, মায়ানমারে ত্রাণের জন্য মানবিক করিডোর, তুরস্ককে অস্ত্র তৈরির কারখানা নির্মাণের অনুমতি দেওয়া, স্টার লিংককে আকাশ সেটেলাইট নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেওয়া এসবই ভূরাজনৈতিক যুদ্ধ চক্রান্তে জড়ানোর এক নীলনকশা।

বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা, আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্য, নৌঘাটি, বিমান বন্দর, তেল শোধনাগার সবই তো বন্দরকে ঘিরেই। ফলে এখানে বিদেশিদের উপস্থিতি দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তার জন্য খুবই হুমকিস্বরূপ। ফলে দেশের স্বার্থেই এই সর্বনাশা লুণ্ঠন পরিকল্পনা ও সামরিক ঝুঁকি রুখে দাঁড়ানো দরকার।

আমরা বাম গণতান্ত্রিক জোটের পক্ষ থেকে দেশের সকল বাম প্রগতিশীল ও দেশপ্রেমিক গণতন্ত্রকামী জনগণকে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন-লুণ্ঠন রুখে দাঁড়ানো এবং বিদেশি কোম্পানিকে বন্দর ইজারা দেওয়ার, মানবিক করিডোর, সমরাস্ত্র কারখানাসহ এই সর্বনাশা চক্রান্তের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ ও গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ) চট্টগ্রাম-এর উদ্যোগে প্রেসক্লাবের সামনে গণ অনশন

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) ও লালদিয়ার চর ইজারা দেয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ) চট্টগ্রাম-এর উদ্যোগে ১ নভেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত জেলা প্রেসক্লাবের সামনে গণ অনশন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

অনশন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন স্কপ কেন্দ্রীয় নেতা ও জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতি মো. আনোয়ার হোসেন। বন্দর সিবিএ-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক কাজী শেখ নুরুল্লাহ বাহারের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন টিইউসি চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সভাপতি তপন দত্ত, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এস কে খোদা তোতন, ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের খোরশেদুল আলম, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক শ. ম. জামাল উদ্দিন, ডক শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক তসলিম হোসেন সেলিম, টিইউসি চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মছিউদ্দৌলা, স্কপের যুগ্ম আহ্বায়ক রিজোয়ানুর রহমান খান, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট চট্টগ্রাম জেলা শাখার আহবায়ক হেলাল উদ্দিন কবির, বিএলএফ চট্টগ্রাম মহানগর কমিটির সভাপতি নুরুল আবসার তৌহিদ, জাহেদ উদ্দিন শাহিন, শানেওয়াজ চৌধুরী মিনু, ইফতেখার কামাল খান, কাজী আনোয়ারুল হক হুনিসহ স্কপভুক্ত শ্রমিক সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন টিইউসি'র কেন্দ্রীয় সংগঠক ফজলুল কবির মিন্টু। সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি কমরেড শাহ আলম, বাসদ চট্টগ্রাম জেলা শাখার ইনচার্জ আল কাদেরী জয়, বাম গণতান্ত্রিক জোট চট্টগ্রাম জেলা সমন্বয়ক শফিউদ্দিন কবির আবিদ, গণমুক্তি ইউনিয়ন চট্টগ্রাম জেলা সভাপতি রাজা মিয়া, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট চট্টগ্রাম নগর শাখার সভাপতি মিরাজ উদ্দিন, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন জেলা আহবায়ক জাহেদুন্নবী কনকসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ছাত্র, নারীসহ পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

নেতৃবৃন্দ চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের সাম্প্রতিক গণবিজ্ঞপ্তিতে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তের নিন্দা জানিয়ে বলেন, প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা বা পুলিশি বাধা দিয়ে কোনো ন্যায্য আন্দোলনকে দমন করা যায়নি, এবারও যাবে না। শ্রমিকেরা ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁদের অধিকার আদায়ে শেষ পর্যন্ত লড়ে যাবে।

অনশন কর্মসূচিতে স্কপ নেতৃবৃন্দ ঘোষণা দেন–অন্তর্বর্তী সরকার যদি অবিলম্বে এনসিটি ও লালদিয়ার চর ইজারা বাতিলের ঘোষণা না দেয়, তবে সার্বিক কর্মবিরতি, চট্টগ্রাম হরতাল ও বন্দর অবরোধসহ আরও কঠোর কর্মসূচি দেয়া হবে।

সিলেটে গ্রেপ্তার কৃত বাসদ-সিপিবি নেতৃবৃন্দের মুক্তি ও হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

নিবন্ধন, রুট পারমিট, চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের জন্য। সরকার ও প্রশাসন ব্যাটারিচালিত যানবাহন উৎপাদন, বিপণন একটি সিন্ডিকেটের হাতে তুলে দিতে চায়। আমরা দাবি করছি ব্যাটারিচালিত যানবাহন আধুনিক করতে হবে, চালক-মেকানিক, মালিকসহ তাদের উপর নির্ভরশীল মানুষের জীবন-জীবিকা রক্ষায় ব্যাটারিচালিত যানবাহন চলাচল বন্ধের কোনও সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া যাবে না।

নগরীর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলিতে ব্যাটারিচালিত যানবাহনের জন্য পার্কিং ও চার্জিং স্টেশন স্থাপন করতে হবে। দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ও সড়কে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় প্রতিটি সড়ক মহাসড়কে স্বল্পগতির ও লোকাল যানবাহনের জন্য পৃথক সাব লেন নির্মাণ ও চালকসহ সংশ্লিষ্টদের ট্রাফিক আইন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ব্যাটারিচালিত যানবাহনের চালকদের কাছ থেকে অবৈধ চাঁদা আদায়, বিট বাণিজ্য, ব্যাটারি ছিনতাই-চুরি বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও নারী চালকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। সকল শ্রমিকের জন্য আর্মি রেটে রেশন, পেনশন, বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রেপ্তারকৃত নেতৃবৃন্দকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে এবং তাদের নামে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। শ্রমিকের জীবিকার ওপর আক্রমণ করা যাবে না।

কমরেড ফিরোজ বলেন, শ্রমজীবী মানুষের জীবিকা কেড়ে নিয়ে কোন সংস্কার সফল হবে না। ইউনুস সাহেব বলছেন মানুষ চাকরির জন্য যাবে না, নিজেরা উদ্যোক্তা হবেন। এখন রিকশা চালকরা যদি বলেন, আমরা আপনার কথা মতো চাকরির জন্য না গিয়ে স্বাধীন উদ্যোক্তা হয়ে রিকশা চালাচ্ছি কিন্তু আপনার প্রশাসন এখন আমাদের গ্রেপ্তার করে জেলে ঢুকাচ্ছে কেন? ব্যাটারিচালিত যানবাহন উচ্ছেদ করে ধ্বংস করছে কেন? গ্যারেজ মালিকদের হয়রানি করছে, বৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করছে কেন? এগুলো বন্ধ করতে হবে। আপনি মুখে বেকার সমস্যা সমাধানের কথা বলবেন আর মানুষের কাজ কেড়ে নিবেন এই দ্বিচারিতা মানুষ মেনে নিবে না।

তিনি বলেন, দেশে আন্দোলন ছাড়া কোনও দাবি আদায় হয়নি, লড়াই ছাড়া মুক্তি নাই। অভ্যুত্থানে সবচেয়ে বেশি নিহত হয়েছে শ্রমজীবী মানুষ তাদের জন্য পুরস্কার নাই নিপীড়ন-নির্যাতন ও হয়রানি আছে। বিগত সরকারের মতো এই সরকারের সময়েও শ্রমিকদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ফলে, আজকে আমাদের দল চিনতে হবে নেতৃত্ব চিনতে হবে। আমরা আপনাদের আন্দোলনে সংহতি জানাতে এসেছি। আপনাদের ওপর যে নির্যাতন হচ্ছে তার প্রতিবাদ জানাতে এসেছি। সিলেটের শ্রমজীবী মানুষ একা নয় আমরা আপনাদের সাথে আছি। প্রশাসনকে বলছি অতি উৎসাহী হয়ে শ্রমজীবী মানুষের মুখের ভাত কেড়ে নিবেন না, আপনারা সংযত হউন। যারা গত ৪৫-৪৬ দিন ধরে বেকার তাদের চুলায় আগুন জ্বলছে কিনা, হাড়িতে খাবার আছে কিনা খবর নিন। সিলেটের সমস্যার সমাধান করুন, গ্রেপ্তার হয়রানি বন্ধ করুন, গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তি দিন। অন্যথায় আমরা দেশব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করব। ইউনূস সরকারকে বলছি আপনি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি হওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করবেন না, এর পরিণতি ভালো হবে না।

চট্টগ্রাম বন্দর বিদেশি কোম্পানির হাতে ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার কর

◆ চট্টগ্রাম বন্দর দেশের বিনিয়োগকৃত লাভজনক প্রতিষ্ঠান। দেশের সম্পদ বিদেশি কোম্পানির কাছে ইজারা দেওয়া কার স্বার্থে?

◆ বিদেশি কোম্পানি বিনিয়োগের অজুহাতে সেবার মূল্য বাড়াবে। এতে দেশের আমদানি-রপ্তানির খরচ বাড়বে

◆ দেশের সংবেদনশীল আমদানি পণ্য (যেমন : প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম) বিদেশিদের নজরদারিতে চলে যাবে

◆ চট্টগ্রাম বন্দর কেবল একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নয়; এটি কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ বন্দর বিদেশি নিয়ন্ত্রণে চলে গেলে জাতীয় নিরাপত্তার ঝুঁকি বাড়বে

◆ বন্দর ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত জাতীয় স্বার্থবিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের কাছে নতজানু হওয়ার নীতি

◆ জাতীয় সক্ষমতা না বাড়িয়ে বিদেশিদের হাতে দেশের সম্পদ তুলে দেওয়া দেশবাসী মানবে না।

চট্টগ্রাম বন্দর বিদেশিদের ইজারা দিলে দেশের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব হুমকিতে পড়বে সরকারের নতজানু নীতি ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন রুখে দাঁড়ানোর জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানালেন নেতৃবৃন্দ।

বাম গণতান্ত্রিক জোট এর উদ্যোগে ১৬ অক্টোবর ২০২৫ বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি কার্যালয়ের মৈত্রী মিলনায়তনে 'চট্টগ্রাম বন্দর বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার জাতীয় স্বার্থ বিরোধী সিদ্ধান্ত মোকাবিলায় করণীয়' শীর্ষক এক মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন ও ধারণাপত্র পাঠ করেন বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক ও বাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ। মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন, কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, ইকবার কবির জাহিদ, সাজ্জাদ জহির চন্দন, শাহ আলম, মোশরেফা মিশু, মাসুদ রানা, আব্দুল আলী, শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, ডা. মুশতাক হোসেন, হারুন অর রশীদ ভূইয়া, রজত হুদা, ডা. আবু সাঈদ, ডা. হারুন অর রশীদ, মুক্তা বাড়ৈ, মাশুক শাহী, সাদিয়া তাসনিম নৌশিন, মফিজুর রহমান লাল্টু, শামীম ইমাম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ধারণাপত্র

শ্রদ্ধেয় আলোচকবৃন্দ, রাজনৈতিক দল ও শ্রেণিপেশার নেতৃবৃন্দ, বাম গণতান্ত্রিক জোটের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আপনারা অবগত আছেন যে, জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে জনগণের স্বার্থের বিপক্ষে কাজ করা শাসকদের অত্যন্ত পুরনো এবং কার্যকরি কৌশল। সেই কৌশলের ফাঁদে আবারও বাংলাদেশের জনগণ আটকা পড়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ঘোষণা করেছে, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের এনসিটি, লালদিয়ার চর, পতেঙ্গায় লালদিয়া কন্টেইনার টার্মিনাল এবং ঢাকার কেরানিগঞ্জের পানগাঁও টার্মিনাল বিদেশি অপারেটরের হাতে ছেড়ে দেয়া হবে। এখানেই শেষ নয় ধারণা করা হচ্ছে পতেঙ্গায় বে টার্মিনাল-১ এবং-২ এই দুই টার্মিনালও বিদেশিদের কাছে ইজারা দেওয়া হবে।

দেশের সমুদ্র বন্দর ৪টি। চট্টগ্রাম-মংলা, পায়রা, মাতারবাড়ি। চট্টগ্রাম বন্দরের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৮৮৮ সালে, মংলা ১৯৫০, পায়রা ২০১৬ সালে আর সীমিত পরিসরে মাতারবাড়ি কাজ শুরু করলেও পুর্নাঙ্গ রূপে চালু হতে ২০৩০ সাল লেগে যাবে। দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের ৮৩ শতাংশ প্রায় ১১ লাখ কোটি টাকার পণ্য পরিবহন হয়েছে ২০২৪ সালে। আর সমুদ্রপথে কন্টেইনার পরিবহনের ৯৯ শতাংশ পরিবাহিত হয় চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে। এই বন্দর নিয়ে তাই প্রচণ্ড আগ্রহ মুনাফালোভী দেশি-বিদেশি কোম্পানি এবং ভূরাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাশী দেশসমুহের এবং উদ্বেগ দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে যারা ভাবেন তাদের।

কোন দেশের সম্পদের উপর মালিকানা কার হাতে থাকবে সারা পৃথিবীতেই এটা এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সম্পদগুলোর একটি হলো চট্টগ্রাম বন্দর। দেশের মাটির নিচের গ্যাস, কয়লা ফুরিয়ে যাবে কিন্তু আমদানি রপ্তানি বন্ধ হবে না, বরং বাড়বে। দেশের প্রায় ৯০ বিলিয়ন ডলারের আমদানি এবং ৫৬ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ দেশের প্রবেশ মুখ হিসেবে বন্দরের গুরুত্ব। কোন দেশের সমুদ্রবন্দর কেবল অর্থনীতির বিষয় নয়; এটি একটি নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা কৌশলগত বিষয়ও বটে। এর ফলে জাতীয় সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ বিদেশি কোনো কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে কি না, এই বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১৬ অক্টোবর ২০২৫ চট্টগ্রাম জেলার স্কপ এর অনশন কর্মসূচি

দেশের প্রবেশ মুখে বিদেশি কোম্পানি, সংকটের পদধ্বনি

বিদেশি কোম্পানিকে বন্দর কিংবা বন্দরের কোন টার্মিনাল ইজারা দিলে তাঁরা পরিচালনা, বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত এবং প্রবেশাধিকারসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। দেশ যদি দুর্বল হয় আর বিদেশি কোম্পানি যদি সবল হয় তাহলে জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিদেশি কর্তৃত্বের অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে; ভবিষ্যতে বন্দর নিয়ে জটিলতা ও বিরোধ তৈরি হতে পারে, এমনকি জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং নিরাপত্তাও হুমকির মুখে পড়তে পারে। ফলে আশঙ্কা করা স্বাভাবিক এবং প্রশ্ন তোলাও যৌক্তিক যে, চট্টগ্রাম বন্দরের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার পরিচালনা বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়া দেশের জন্য কতটা ঝুঁকিপূর্ণ।

বাংলাদেশের তিনদিকে ভারত দিয়ে ঘেরা আর একদিকে একটুখানি সমুদ্র। যে দেশের সীমানায় সমুদ্র নেই সেই দেশ খুবই অভাগা। কিন্তু সমুদ্র থেকেও যদি তার নিয়ন্ত্রণ নিজেদের না থাকে তাহলে সে দেশকে বলা হবে দুর্ভাগা। ফলে সমুদ্র এবং তার ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের কথা যদি বিবেচনা করা হয়, তাহলে দেশের আমদানি ও রপ্তানির প্রধান গেটওয়ে চট্টগ্রাম বন্দর। আর এই বন্দরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নিউ মুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল বা এনসিটি। দেশের মোট কনটেইনার পণ্য ওঠানামার ৫৫ শতাংশই হয় এনসিটি দিয়ে। পণ্য ওঠানামার আধুনিক সব উপকরণ ও যন্ত্রপাতি রয়েছে এই টার্মিনালে এবং এ থেকে বছরে হাজার কোটি টাকার বেশি রাজস্ব আয় করে বন্দর কর্তৃপক্ষ। ফলে শুধু চট্টগ্রাম বন্দরই নয়, দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে এনসিটি। এই টার্মিনাল বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের হাতে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। প্রতিবাদ হয়েছিল তখনও। বিগত সরকারের পরিকল্পনাই বর্তমানের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এগিয়ে নিচ্ছে। যা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

বন্দর নিয়ে অতীতের ষড়যন্ত্র এবং সারাদেশের মানুষের লড়াই

একটু অতীতের দিকে চোখ ফেরানো যাক! ১৯৯৮ সালে চট্টগ্রাম বন্দর স্টিভেডর সার্ভিসেস অফ আমেরিকা (এসএসএ) নামের একটি ভুয়া প্রতিষ্ঠানকে ১৯৮ বছরের জন্য লিজ দেয়ার পরিকল্পনা করে আওয়ামী লীগ। তার বিরুদ্ধে বামপন্থি দলসমুহ, চট্টগ্রাম বন্দরের ২২ টি শ্রমিক সংগঠন, তেল-গ্যাস, খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। দাবি উঠেছিল বন্দরের মতো স্পর্শকাতর স্থাপনা বিদেশিদের হাতে তুলে দিলে তা ভয়াবহ পরিনতি ডেকে আনতে পারে। বিশেষত, যে দেশে একটিই মাত্র সমুদ্র বন্দর সেই দেশের জন্য। আন্দোলনের মুখে আদালতে ভুয়া প্রমাণিত হওয়ার পর সেই চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ২০০১ সালে চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণ শুরু হয়। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ নিজস্ব তহবিল থেকে ২ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে এই টার্মিনাল নির্মাণ করে। বন্দরের মূল আয়ের ৬০ ভাগ আসে এই টার্মিনাল থেকে। এ টার্মিনালের জন্য ২ হাজার কোটি টাকার অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে এই টার্মিনালের উৎপাদনশীলতা অনেকগুণ বেড়েছে। যার ফলে ২০০৭ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত এই একটি টার্মিনালেই ১ কোটি ১৮ লাখ ৬৩ হাজার টিইইউএস (২০ ফুট সমমানের) কনটেইনার হ্যান্ডলিং করা হয়েছে। বন্দর কর্তৃপক্ষের মতে এই টার্মিনালে বর্তমানে যে পরিমাণ ইক্যুইপমেন্ট আছে তা দিয়ে আগামী ১৫ বছর বন্দরের কার্যক্রম চালানো যাবে। নিউ মুরিং টার্মিনাল চট্টগ্রাম বন্দরের চারটি টার্মিনালের মধ্যে সবচেয়ে বড়, এখানে এক সাথে চারটি সমুদ্রগামী জাহাজ ভিড়তে পারে। টারমিনালে স্বয়ংক্রিয় ক্রেন থাকায় দ্রুতগতিতে কন্টেইনার ওঠানো ও নামানো যায়। বন্দরের হিসাবে, গত বছর লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে তিন লাখ কন্টেইনার বেশি ওঠানামা হয়েছে এই টার্মিনালে।

দেশের টাকায় তৈরি টার্মিনাল বিদেশিদের ব্যবস্থাপনায় দেওয়া হবে কেন?

পৃথিবীর অনেক দেশেই বিদেশি বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনায় বন্দর পরিচালিত হয়। দেশের কোনো বন্দরে বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে আনা হয় দুটো কারণে। এর একটি হলো নিজেদের পুঁজি না থাকায় বিনিয়োগ পাওয়া, আর অন্যটি হলো উন্নত যন্ত্রপাতি এবং দক্ষ কর্মীর সাথে থেকে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি কিন্তু নিউমুরিং টার্মিনালে নতুন করে এসব খাতে বিনিয়োগের কোন সুযোগ যেমন নেই, তেমনি পাশেই নৌঘাঁটি থাকায় এটি সম্প্রসারণেরও সুযোগ নেই। প্রশ্ন উঠে, তাহলে কেন এই উৎসাহ?

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উদাহরণ দেয়া হয়ে থাকে যে সেসব দেশে বিদেশি বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনায় বন্দর পরিচালিত হয়। কিন্তু সেসব দেশগুলোতে বন্দর কতগুলো, তারও তুলনামূলক আলোচনা করা দরকার। যেমন ভিয়েতনামে ২৯৬ টি বন্দর আছে তার মধ্যে হাইফং, কাই মেপ- থি ভাই এবং সাইগন বিশ্বের শীর্ষ ৫০ টি কন্টেইনার বন্দরের অন্যতম। শ্রীলংকায় ৮ টি বন্দর, পাকিস্তানে ৩৭টি বন্দর যার মধ্যে ৩টি আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দর, ভারতে ২৩০টি বন্দর যার মধ্যে ১২ টি প্রধান বন্দর যেগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পরিচালিত হয়। ভারতের এই বন্দরগুলোর মাধ্যমে সে দেশের ৯৫ শতাংশ

এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

মার্স্সবাদ ও সংস্কার : ভ. ই লেনিন

সংস্কার হলো শ্রমিকশ্রেণির জন্য একটা ধোঁকাবাজির নাম। কারণ শ্রমিকরা নিজেদের যতই ব্যক্তিগত উন্নতি সাধন করুক না কেন, যতদিন পুঁজিবাদ থাকবে ততদিন তারা মজুরি দাসই থাকবে।

উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা এসব সংস্কার এক হাতে করে, আরেক হাতে ফেরত নেয়। তারা এসব সংস্কারের নামে শ্রমিকশ্রেণিকে বিভক্ত করে, এর মধ্য দিয়ে তাদেরকে আরও বেশি দাসত্বের বন্ধনে আটকায় এবং মজুরি দাসত্বের স্থায়িত্বটা পাকাপোক্ত করে।

এই কারণেই সংস্কার—তা যতই আন্তরিক হোক না কেন, সত্যিকার অর্থে বুর্জোয়াদের একটা অস্ত্রেই পরিণত হয় যা দিয়ে বুর্জোয়ারা শ্রমিকদের কলুষিত করে, শ্রেণি হিসেবে দুর্বল করে। সব দেশের অভিজ্ঞতা বলে, যারা বুর্জোয়াদের সংস্কারের কথায় যতবার বিশ্বাস করেছে, তারা ততবারই প্রতারিত হয়েছে।

আবার ঠিক বিপরীত দিকে, যে শ্রমিকেরা মার্কসবাদের দীক্ষায় দীক্ষিত হয়েছে—যারা বুঝেছে যে, পুঁজিবাদ যতদিন আছে ততদিন অবধারিতভাবেই মজুরি দাসত্ব থাকবে, তাদেরকে এসব ঠুনকো পুঁজিবাদী সংস্কার বোকা বানাতে পারে না। যেহেতু তারা জানে যে, পুঁজিবাদ থাকলে এসব সংস্কার খুব সুদুরপ্রসারী বা অর্থবহ হবে না, সেহেতু তারা এগুলিকে ব্যবহার করে মজুরি দাসত্বের বিরুদ্ধে তাদের লড়াইকে শক্তিশালী করে ও তাদের সংগ্রাম জারি রাখে।

সংস্কারপন্থিরা শ্রমিকশ্রেণিকে এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুবিধা দিয়ে তাদেরকে বিভক্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু সচেতন শ্রমিকরা এসব সংস্কারের অন্তঃসারশূন্যতা বোঝে এবং সেকারণেই তারা এগুলিকে ব্যবহার করে শ্রেণিসংগ্রাম শক্তিশালী করার চেষ্টা অব্যাহত রাখে।

সংস্কারের প্রভাব শ্রমিকশ্রেণির উপরে বেশি পড়ে। তারা যত দুর্বল হয়, তত তারা বুর্জোয়াদের উপর নির্ভরশীল হয়। ফলে বুর্জোয়াদের জন্য বিভিন্ন কূটকৌশলে তাদের গৃহীত সংস্কারগুলি বাতিল করে দেয়া খুব সহজ হয়ে যায়।

শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলন যত আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়, যত সংস্কারপন্থি সংকীর্ণতামুক্ত হয়, এর লক্ষ্য যত বিস্তৃত ও সুগভীর হয়, ততই শ্রমিকরা সহজে তাদের উন্নতি অর্জন ও রক্ষা করতে পারে।

যে কারণে জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করেনি চার বামদল

শেষ পৃষ্ঠার পর

নেতাকে আহ্বান করা হলেও আমাদের দলসমূহের কাউকে বক্তব্য দিতে আহ্বান জানানো হয়নি। আমরা মনে করি, ইচ্ছাকৃতভাবেই জাতীয় ঐকমত্য কমিশন এ কাজটি করেছে। প্রধান উপদেষ্টার সামনে ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগ বন্ধ করতেই এ ধরনের অন্যায্য আচরণ করা হয়েছে। এতে আমরা বিস্মিত হয়েছি।

প্রধান উপদেষ্টা ঐকমত্য কমিশনের যাত্রার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, সব দল যেসব বিষয়ে একমত হবে শুধু সেগুলোই ঐক্যমত্য হিসেবে বিবেচিত হবে। আমরাও প্রধান উপদেষ্টার সাথে একমত পোষণ করেছিলাম এবং ঐক্যমত্য কমিশনের সব সভায় উপস্থিত থেকে আমাদের মতামত ব্যক্ত করেছি। কিন্তু জুলাই সনদের যে চূড়ান্ত কপি ১৪ অক্টোবর আমাদের কাছে পাঠিয়েছে সেখানে সর্বসম্মত বিষয় ছাড়াও নোট অব ডিসেন্ট দেওয়া প্রস্তাবগুলো সনদে যুক্ত করেছে। আমাদের দেওয়া নোট অব ডিসেন্টগুলোর কারণও যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি।

১. আমরা জুলাই সনদ নিয়ে আলোচনাকালেই বারবার বলেছি, যেসব বিষয়ে সবার ঐকমত্য রয়েছে কেবলমাত্র সেসব বিষয়েই সবার স্বাক্ষর নেয়া যেতে পারে। ভিন্নমতগুলো অতিরিক্ত (এনেক্স) প্রতিবেদন হিসেবে সনদে সংযুক্ত থাকতে পারে।

২. সনদের প্রথম অংশে পটভূমিতে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাস এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়নি। আমরা বারবার সংশোধনী দিলেও সেগুলো সন্নিবেশিত করা হয়নি।

৩. শেষ অংশে জুলাই সনদ বাস্তবায়নে অঙ্গীকার করতে বলা হয়েছে। সেখানে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কোনো বিষয়ে কারো ভিন্নমত থাকলে তা পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার কীভাবে সম্ভব তা আমাদের কাছে বোধগম্য নয়।

৪. অঙ্গীকারনামার ২নং-এ জুলাই সনদ সংবিধানের তফসিলে বা যথোপযুক্ত স্থানে যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। আমরাও সর্বসম্মত বিষয়গুলো নিয়ে জুলাই সনদ সংবিধানে যুক্ত করার পক্ষে। কিন্তু নোট অব ডিসেন্টসহ কীভাবে সংবিধানে যুক্ত হবে, তা আমাদের বোধগম্য নয়।

৫. অঙ্গীকারনামার ৩নং-এ 'জুলাই সনদ নিয়ে কেউ আদালতের শরণাপন্ন হতে পারবে না' এটি নাগরিকের মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারের সম্পূর্ণ পরিপন্থি।

৬. এছাড়াও সংবিধানের ১৫০ (২) অনুচ্ছেদে ক্রান্তিকালীন বিধানে ষষ্ঠ তফসিলে থাকা স্বাধীনতার ঘোষণা ডিক্লারেশন অব ইনডিপেন্ডেন্স এবং সপ্তম তফসিলে থাকা প্রক্লেমেশন অব ইনডিপেন্ডেন্স বাদ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। যা আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি সেটা বাদ দিলে তো বাংলাদেশের অস্তিত্বই থাকে না। অথচ জুলাই সনদ সংবিধানের তফসিলে যুক্ত করার কথা বলা হচ্ছে।

৭. পটভূমিতে অভ্যুত্থান পরবর্তী সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের রেফারেন্স নিয়ে সংবিধান মেনেই অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হওয়ার কথা পূর্বে পাঠানো খসড়া সনদে উল্লেখ থাকলেও চূড়ান্ত সনদে ১০৬ অনুচ্ছেদের কথা বাদ দেয়া হয়েছে।

সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার চার মূলনীতি বাদ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে চূড়ান্ত জুলাই সনদে এবিষয়ে আমরা শুধু ভিন্নমত না ঘোরতর আপত্তি করে সভা থেকে উয়ার্কআউট করেছিলাম। আমাদের ভিন্নমত আমলে নেয়নি কমিশন। যে কারণে তার কোনো প্রতিফলন নেই। ফলে ঐকমত্য কতটা ঐক্যের সে প্রশ্ন রয়ে গেল।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর নিষ্পত্তি না হওয়াতে আমাদের পক্ষে জুলাই সনদে স্বাক্ষর করা সম্ভব হচ্ছে না। বিশেষ করে সংবিধানে বিদ্যমান চার মূলনীতি–গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ এবং ১৫০ (২) অনুচ্ছেদের ক্রান্তিকালীন বিধানের তফসিল পরিবর্তনে সম্মতি প্রদান ও আদালতে প্রশ্ন করা যাবে না এমন বিষয়ে অঙ্গীকার করতে হয় এমন কোনো সনদে ভিন্নমত দিয়ে আমরা স্বাক্ষর করতে পারি না।

জুলাই সনদে বিধৃত যেসব বিষয়ে আমরা সম্মত হয়েছি সেগুলো বাস্তবায়িত করতে আমরা জাতির কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ। জাতীয় সংসদের ভেতর ও বাইরে সেসব বিষয় বাস্তবায়িত করতে আপনাদের মাধ্যমে আমরা জাতির কাছে দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করছি।

ইলা মিত্রের জন্মশতবার্ষিকীতে সমাবেশ অনুষ্ঠিত

১২ পৃষ্ঠার পর

সাথে আলোচনা করে ঐকমত্যা প্রতিষ্ঠার জন্য ঐকমত্য কমিশন করা হয়েছে। কমিশন তিন দফায় মোট ৭২ দিন রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য শক্তির সঙ্গে আলোচনা করে।

আমাদের দল বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদসহ চারটি বামপন্থি দল জুলাই সনদে স্বাক্ষর করিনি। আমরা বলেছি, যে সনদ ৩০ লাখ শহিদের রক্তের স্বীকৃতিকে অস্বীকার করতে চায়, তাতে আমরা স্বাক্ষর করতে পারি না। সংবিধানের চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতিকে জুলাই অভ্যুত্থান দিয়ে প্রতিস্থাপন করে বাদ দিতে চায়। তারা মুক্তিযুদ্ধের অবদানকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে চায়। আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে অস্বীকার করতে পারি না। আমরা আশার দিক হিসেবে দেখছি —কেউ বাংলাদেশ সৃষ্টির ইতিহাস মুছে ফেলতে পারবে না। একটি জাতি-রাষ্টের জন্ম ইতহাস তার অস্তিত্বের সাথে যুক্ত হয়ে থাকে।

কমরেড ফিরোজ পুঁজিবাদী শাসন-শোষণ, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন-লুণ্ঠন ও মৌলবাদী আস্ফালনের বিরুদ্ধে রাজপথে লড়াই শানিত করার জন্য শ্রমিক, কৃষক-আদিবাসী, নারীসহ সর্বস্তরের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। আমরা '৭১ সালে যেমন স্বাধীনতার বিরোধীদের মোকাবিলা করেছি, তেমনিভাবে সে চেতনা রক্ষা করব।

সভাপতির বক্তব্যে শম্পা বসু বলেন, ইলা মিত্র নারী আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, সাঁওতাল-আদিবাসী আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলনের লড়াকু সৈনিক। তিনি গরিব-দুঃখি মেহনতি সাঁওতাল কৃষকদেরকে জোতদার, জমিদার ও মহাজনদের শাসন-শোষণ ও অত্যাচার থেকে মুক্ত করার জন্য ইস্পাতদৃঢ় সংকল্প নিয়ে লড়াই করেছেন। ইলা মিত্রের স্বপ্ন ছিল সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমে একটি শোষণ-বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। জেল-জুলুম-হুলিয়া কোনো কিছুই তাঁকে এই সংগ্রাম থেকে বিরত রাখতে পারেনি।'

সমাবেশ উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা কমরেড খালেকুজ্জামান। সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ। এছাড়াও বক্তব্য প্রদান করেন সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট এর সহসভাপতি অধ্যক্ষ ওয়াজেদ পারভেজ, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নরেন পাহান, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. দিলরুবা নূরী, সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. মনীষা চক্রবর্ত্তী। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের সভাপতি প্রকৌশলী শম্পা বসু এবং পরিচালনা করেন সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট এর সহসভাপতি জয়নাল আবেদীন মুকুল।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের রায়ের প্রতিক্রিয়া

বাম গণতান্ত্রিক জোট কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের এক সভা ১৮ নভেম্বর '২৫ ২৩/২ তোপখানা রোডস্থ বাসদ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বাম গণতান্ত্রিক জোট কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদে সভার এক প্রস্তাবে ১৭ নভেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে দেওয়া জুলাই হত্যাকাণ্ডের মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের রায়ের প্রতিক্রিয়ায় বলা হয়, গত বছরের জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থানে হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু ও ন্যায় বিচারের দাবি বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণের। যে কোন হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী অপরাধীদের বিচার প্রতিটি গণতন্ত্রকামী মানুষের কাম্য। ফলে জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচারে শহিদ ও আহত-পঙ্গুত্ববরণকারী পরিবার যেমন কিছুটা হলেও স্বস্তি পেয়েছে আমরাও দেশবাসীর অংশ হিসেবে স্বচ্ছ সুষ্ঠু বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভিক্টিম পরিবার এবং অভিযুক্ত উভয়েরই যাতে ন্যায় বিচার পায় সে দাবি দীর্ঘদিন ধরে করে আসছি। এটা দেশবাসীর প্রত্যাশা ফলে বিচারের রায়ে প্রমাণ হয়েছে কেউই আইনের উর্ধ্বে নয়।

প্রস্তাবে বলা হয়, আমরা শুধু আশা করবো বিচারিক প্রক্রিয়া নিয়ে যেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কোন ক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ না হয়। এবং আপিল ও রিভিউসহ বিচারের সকল ধাপ যেন সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন করা হয়।

প্রস্তাবে বলা হয়, আদেশ দাতাদেরকে যেখানে সুপিরিয়র রেসপন্সিবিলিটির অভিযোগে ক্যাপিটাল পানিসমেন্ট দেওয়া হয়েছে সেখানে আদেশ পালনকারী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রধান আইজিপিকে রাজস্বাক্ষী বানিয়ে মাত্র ৫ বছরের সাজা দেওয়া শহিদ পরিবার যেমন মেনে নেয়নি তেমনি বাম জোটের পক্ষ থেকে আমরাও এটাকে গ্রহণ করতে পারিনি।

তাছাড়া জুলাই হত্যাকাণ্ডের এত এভিডেন্স ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও ডিভাইসে রয়েছে এবং জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্টেও বলা হয়েছে তাদের কাছেও বহু এভিডেন্স রয়েছে, সরকার চাইলে তারা দেবে। ফলে এই মামলায় রাজস্বাক্ষীর কোন প্রয়োজন ছিল না।

প্রস্তাবে সাবেক আইজিপি'র বিচারের যথাযথ শাস্তি নিশ্চিতে রাষ্ট্রপক্ষকে আপিল করার আহ্বান জানানো হয়। না হলে পুলিশ, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভবিষ্যতে আরও বেপরোয়া হয়ে হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করে রাজস্বাক্ষী হয়ে পার পেয়ে যাওয়ার প্রবণতা বাড়তে পারে।

প্রস্তাবে জুলাই-আগস্টের সকল হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত এবং সকল দোষীদের শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানানো হয় যাতে ভবিষ্যতে কেউ ফ্যাসিবাদী হয়ে ওঠতে গেলে অন্তত একবার হলেও চিন্তা করে।

MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
● বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র
● নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২৫
● ২৩/২ তোপখানা রোড (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১০০০। ফোন : ০২ ৪১০৫৩৬৪৪
● Website : www.spb.org.bd

চেতনা ও অঙ্গীকারের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ জুলাই সনদে স্বাক্ষর করেনি চার বামদল

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)
বাসদ (মার্কসবাদী)
বাংলাদেশ জাসদ

১৭ অক্টোবর ২০২৫ জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করেনি বাসদ, সিপিবি, বাসদ (মার্কসবাদী) ও বাংলাদেশ জাসদ। চারটি দল ১৬ অক্টোবর বিকেল ৩টায় মুক্তিভবনের মৈত্রী মিলনায়তনে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে দেশবাসীর কাছে তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন বাংলাদেশ জাসদের স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. মুশতাক হোসেন, সিপিবির সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ ক্বাফী রতন, বাসদ (মার্কসবাদী) সমন্বয়ক মাসুদ রানা। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন সিপিবির সভাপতি কাজী সাজ্জাদ জহির চন্দন, সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ শাহ আলম ও সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স, বাসদের সহকারী সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নিখিল দাস, বাংলাদেশ জাসদের স্থায়ী কমিটির সদস্য আনোয়ারুল ইসলাম বাবু, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল কবীর জাহিদ, সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলী প্রমুখ।

সাংবাদ সম্মেলনের বক্তব্য

১৭ অক্টোবর জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজাতে জুলাই সনদে স্বাক্ষর প্রদান অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে। আমরা এখানে উপস্থিত দলসমূহ এতে আমন্ত্রিত হয়েও কেন অংশ নিতে পারছি না, সে বিষয়ে আপনাদের মাধ্যমে দেশবাসীকে অবহিত করার জন্য আজকের এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছি।

প্রিয় দেশবাসী

আপনারা জানেন, গত বছর ৫ আগস্ট দেশে ছাত্র-শ্রমিক, জনতার এক অভুতপূর্ব গণ অভ্যুথান সংগঠিত হয়েছে। ফ্যাসিবাদী শেখ হাসিনার সরকার দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। দেশবাসীর প্রত্যাশা ছিল অন্তর্বর্তী সরকার দেশে গণতন্ত্রের পথে উত্তরণের জন্য রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সংস্কার, গণ অভ্যুত্থানে হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ীদের বিচার এবং একটি সুষ্ঠু অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা, যাতে ফ্যাসিবাদের পুনরুত্থান রোধ করা যায়। সরকার সংস্কারের জন্য ১১টি কমিশন গঠন করে। প্রথমে গঠিত ৬টি সংস্কার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে ৩০-৩৭টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে আলোচনা ও মতামত গ্রহণ শেষে প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করে, দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনা ৩ জুন শুরু হয়ে ৩১ জুলাই সমাপ্ত হয়। জামায়াত, এনসিপিসহ কয়েকটি দলের দাবির প্রেক্ষিতে তৃতীয় পর্যায়ে জুলাই জাতীয় সনদের বাস্তবায়ন নিয়ে ৫ দিন আলোচনা হয়ে ৮ অক্টোবর শেষ হয়।

১৫ অক্টোবর বিকেলে ঐকমত্য কমিশনের এক আকস্মিক আমন্ত্রণে আমরা ৩০টি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে উপস্থিত হই। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা সেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। জুলাই সনদে স্বাক্ষর ও এর বাস্তবায়ন বিষয়ে বক্তব্য দেবার জন্য ঐকমত্য কমিশন কর্তৃক অনেক

এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

বঞ্চিত কৃষক-উপেক্ষিত আদিবাসী ও নিপীড়িত নারী সমাবেশ

তেভাগা আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেত্রী ইলা মিত্রের জন্মশতবার্ষিকী পালন

১৮ অক্টোবর ২০২৫, তেভাগা আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেত্রী নাচোলের রানিমা ইলা মিত্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে নওগাঁ জেলা শহরের মুক্তির মোড়ে অবস্থিত মুক্তমঞ্চে কৃষক-আদিবাসী ও নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট এবং সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই সমাবেশে কৃষক-খেতমজুর, আদিবাসী, ভূমিহীন-শ্রমজীবী মানুষ ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম জোরদারের প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। সমাবেশের পূর্বে তীর-ধনুক, দাবিসম্বলিত ব্যানার-ফ্যাস্টুনসহ সুসজ্জিত এক মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশের উদ্বোধনী বক্তব্যে বাসদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান উপদেষ্টা, বীর মুক্তিযোদ্ধা কমরেড খালেকুজ্জামান এই স্মরণীয় অনুষ্ঠানের সংগ্রামী সভাপতি, প্রধান বক্তাসহ বক্তাবৃন্দ, অভ্যাগত অতিথিবৃন্দ, নানা স্থান থেকে আগত সংগ্রামী সুধী সাথিবৃন্দ, অনুষ্ঠানের আয়োজক সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট ও সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের নেতৃবৃন্দ, নওগাঁ জেলায় অনুষ্ঠানকে সফল করে তুলতে অক্লান্ত পরিশ্রমী নেতাকর্মী, সমর্থক সুধীবৃন্দ, উপস্থিত সর্বস্তরের ছাত্র শ্রমিক কৃষক নারী আদিবাসী, পেশাজীবী, সংবাদকর্মী সবাইকে সশ্রদ্ধ সালাম ও রক্তিম অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, আমরা আজ এমন একজন সংগ্রামী মানুষের জন্ম শতবর্ষ স্মৃতি ধরে রাখতে এবং সে উপলক্ষে স্মরণ কর্মসূচি পালন করতে নওগাঁর মুক্তমঞ্চে একত্রিত হয়েছি, যিনি আমাদের জাতীয় জীবনের দীর্ঘ সংগ্রামী ইতিহাসের এক বিশেষ অধ্যায়ের অন্যতম বিশিষ্ট উজ্জ্বল নক্ষত্র; তিনি ইলা মিত্র। জমিদার পরিবারের আকর্ষণ ও সদ্য বিভক্ত ভিনদেশি জীবনের বৈভব উপেক্ষা করে সাথি হয়েছিলেন বঞ্চিত-নিপীড়িত, কৃষক-আদিবাসীদের সাথে তেভাগা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে। স্বামী কৃষক আন্দোলনের নেতা রমেন মিত্র ছিলেন অনুপ্রেরণাদায়ী সাথি। ইলা মিত্র পুরুষ কৃষকদের পাশাপাশি অসংখ্য কিষাণী নারীদেরও জাগিয়েছিলেন অধিকার আদায়ের সংগ্রামী প্রেরণায়। যেমন দীনেশ্বরী, জয়মনি, রোহিনী, ভান্ডারী, ফুলেশ্বরী, ভূতেশ্বরী, মধুমনি, যমুনা, সরলা-এ ধরনের অনেক আত্মত্যাগী সংগ্রামী বীর নারীদের কথা বলা যায়। ইলা মিত্র ছিলেন তাদের আদর্শ। গোটা উত্তরবঙ্গে গণমানুষের কাছে ইলা মিত্র পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন ‘রানি মা’ হিসাবে। এখনও বয়স্ক মানুষেরা ওই নামেই তাকে সম্বোধন করেন। আজ যখন বিশ্বজুড়ে

এরপর পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

সম্পাদক : রাজেকুজ্জামান রতন। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে প্রকাশক : বজলুর রশীদ ফিরোজ কর্তৃক ২৩/২ তোপখানা রোড (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
সোনালী প্রিন্টিং প্রেস, ১৬৭ ইনার সার্কুলার রোড (ইডেন কমপ্লেক্স), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ০২ ৪১০৫৩৬৪৪, ফ্যাক্স : ০২ ৪১০৫৩৬৪৪; E-mail : monthly.vanguard81@gmail.com